বজ্রশক্তি
সংকলন
আষাঢ় ১৪২৯ | জুলাই ২০২২ | জিলকদ ১৪৪৩
৩২ পৃষ্ঠা ১০ টাকা
কড়া নাড়ছে
তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ
আমাদের করণীয়

সম্পাদকীয়

সূচিপত্র

- *কড়া নাড়ছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ, আমাদের করণীয়* ২
- *ইউক্রেন কি রাশিয়ার জন্য দ্বিতীয় আফগানিস্তান হবে?* . ৫
- *মুসলিম উম্মাহর অনৈক্যের কারণ ও সমাধানের পথ* . . ৮
- *বহুমুখী শিক্ষাব্যবস্থায় বিভ্রান্ত জাতি* ১৪
- *দীন প্রতিষ্ঠায় নারীদের ভূমিকা কী হবে?* ১৭
- *মো'মেন, মুসলিম ও উম্মতে মোহাম্মদী কাকে বলে?* . . .২১
- *জাতীয় ঐক্য সৃষ্টিতে ইসলাম.* ২৪
- *"প্রতিটি শিশুকে ঘিরে পরিবারের স্বপ্ন বাস্তবায়নে কাজ করে চলেছে আপন ফাউন্ডেশন।"* ২৭
- *ইসলামাইজেশনের চুনকাম বনাম প্রকৃত ইসলাম প্রতিষ্ঠা* ৩০

প্রকাশক ও সম্পাদক:
এস এম সামসুল হুদা
১৩৯/১, তেজকুনী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ কর্তৃক মানিকগঞ্জ প্রেস, ৪৪ আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উপদেষ্টামণ্ডলী:
মসীহ উর রহমান
উম্মুত তিজান মাখদুমা পন্নী
রুফায়দাহ পন্নী

প্রচ্ছদ ও লেআউট কম্পোজিশন:
হেলাল উদ্দিন ওবায়দুল হক বাদল

বার্তা ও বাণিজ্যিক কার্যালয়:
২২৩, মধ্য বাসাবো, সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪
০২-৪৭২১৮১১১, ০১৭৭৮-২৭৬৭৯৪

বিজ্ঞাপন বিভাগ:
০১৬৩৪-২০৮০৩৯

ওয়েব:
www.bajroshakti.com
facebook.com/dailybajroshakti

ই-মেইল:
bajroshakti@gmail.com

এবারের সংকলনে যা থাকছে

গত দুই বছর ধরে করোনা মহামারীর সংকটের পর থেকে বিভিন্ন পরিবর্তন এসেছে। অর্থনীতিতে পড়েছে ব্যাপক প্রভাব। মহামারীর পিছু পিছু ক্ষুধা, দারিদ্র, বেকারত্ব, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এমনকি মহাযুদ্ধের টান টান উত্তেজনাও বিরাজ করেছে। মানুষের জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তন হয়েছে ও স্পষ্টভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে করে তুলেছিল অস্থিতিশীল। দেশে করোনার পর বেকারত্বের প্রভাব ও শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটিগুলো যেন প্রকট হয়ে ধরা দিয়েছে। আর সে কারণেই পরিবর্তন আনা হচ্ছে শিক্ষাব্যবস্থায়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সংকট দূর হচ্ছে না। একটি সমস্যা যেন আরো হাজারটি সমস্যার জন্ম দিচ্ছে। সে সংকটকে উপলব্ধি করা ও সেটি থেকে পরিত্রাণের উপায় নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার গুরুদায়িত্ব এখন প্রতিটি চিন্তাশীল জনগণের ঘাড়ে।

যদি শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলত হয় তবে, প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেশ কম। এর ফলে বহু শিক্ষার্থী মেধার সামর্থ থাকার পরেও সুযোগের অভাবে পিছিয়ে যায়। বিগত বছরগুলোর বিভিন্ন ঘটনা তাদের জানার পরিধি যে কতটা সীমিত সেটাই প্রমাণ করেছে। এ জন্য শিক্ষার্থীদের থেকে প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়ভার বেশি। দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করা হলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হতো না। তাই সকল দিক বিবেচনায় নিয়ে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের দিকটিকে মাথায় রেখে মানুষ, প্রযুক্তি এবং প্রকৃতি এ তিনটি বিষয়ের পরিবর্তনকে ধারণ করে শিক্ষাব্যবস্থাকে বিনির্মাণের কথা ব্যাক্ত করেন শিক্ষামন্ত্রী। এছাড়াও শিক্ষক প্রশিক্ষণের কার্যক্রমও চালু করা হয়। তবে গোঁড়ার গলদ সেই বহুমূখী শিক্ষাব্যবস্থা, এখনও জাতিকে বিভ্রান্ত করে রেখেছে।

ইউক্রেন রাশিয়ার আগ্রাসনকে ঘিরে চলছিল চাঞ্চল্য। ইউক্রেনের আগ্রাসী আচরণ ও রাশিয়ার একচ্ছত্রতায় টালমাটাল হয়েছে বিশ্ব রাজনীতি। উভয়সঙ্কটে পড়েছে পশ্চিমা জোট। রাশিয়া জিতলেও যেমন বিপত্তি তেমন হেরে গেলেও। জিতে গেলে রাশিয়া-চীন নতুন জোট পৃথিবীকে পরিচালিত করবে আর হেরে গেলে শুরু হতে পারে পরমাণু যুদ্ধ। তাহলে প্রশ্ন থেকে যায়, এ যুদ্ধের ফলাফল কী হবে?

নারীরা যেখানে একদিকে বিকৃত ধর্মীয় অপব্যাখ্যার ফলে চার দেয়ালের মাঝে আবদ্ধ হয়ে জীবন কাটাচ্ছে তেমনি অন্যদিকে অপসংস্কৃতির প্রভাবে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তাই এ সংকট থেকে বের হয়ে নারীদের একটি ভারসাম্যপূর্ণ উপায়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের কাজে এগিয়ে আসতে হবে। এমনকি যে ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে নারীদের পিছিয়ে রাখার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে সে দীন ও ধর্ম প্রতিষ্ঠায় নারীদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে, সে ভূমিকা কী?

এরকম বেশ কয়েকটি বর্তমান সংকট নিয়ে আমরা আমাদের জুন মাসের সংকলনটি সাজিয়েছি। এ সংকটগুলোর সমাধানে আমাদের করণীয় নিয়েও আলোচিত হয়েছে এ সকল লেখায়। এরই সাথে রয়েছে বিশেষ সাক্ষাতকার। তাই পাঠক প্রতিটি প্রকাশিত লেখা পড়ে তাদের সুচিন্তিত ও গঠণমূলক মন্তব্য আমাদের পাঠাবেন এটাই আমাদের চাওয়া। আমরা আশা করছি, আমাদের প্রতিটি কথা ও শব্দ দেশ ও সমাজের কল্যাণ বয়ে আনবে।

কড়া নাড়ছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ, আমাদের করণীয়

রাকীব আল হাসান

গত দুই বছর বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছে করোনা মহামারীর ভয়াবহতা। প্রতিটা দেশের অর্থনীতিতে এর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। মহামারীর পিছু পিছু ক্ষুধা, দারিদ্র, বেকারত্ব, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি এমনকি যুদ্ধ-মহাযুদ্ধও আসতে পারে এমন আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন অনেক বিশ্লেষক। সেটাই এখন সত্যে পরিণত হচ্ছে। করোনা মহামারীর ডমিনো ইফেক্টে শ্রীলঙ্কা দেউলিয়া, দ্রব্যমূল্য আকাশছোঁয়া, নেপালও সে পথেই এগোচ্ছে। পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থাও খারাপের দিকে। নিরাপত্তার অজুহাতে রাশিয়া ইউক্রেনে হামলা করেছে, এ যুদ্ধের দুই মাস ছাড়িয়েছে। যুদ্ধ বন্ধ হবার আপাতত কোনো সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। যুদ্ধ বন্ধে তুরস্কের মধ্যস্থতায় যে মীমাংসা আলোচনা শুরু হয়েছিল তা কার্যত এখন থেমে গেছে। জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেজ গত কয়েকদিন ধরে আঙ্কারা, মস্কো এবং কিয়েভ সফর শেষ করার পর শান্তি প্রক্রিয়ায় যে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে তাতে গভীর হতাশা প্রকাশ করেছেন। যুদ্ধ শুরুর দিকে অনেকেই ভেবেছিলেন যে, অল্প সময়ের মধ্যেই ইউক্রেন হয়ত আত্মসমর্পণ করবে কিন্তু কিয়েভের শক্ত প্রতিরোধ ও মস্কোর কৌশল পরিবর্তন ইঙ্গিত দিচ্ছে যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হওয়ার। ইউক্রেনের যুদ্ধ বছরের পর বছর চলতে পারে এবং তার জন্য পশ্চিমা প্রতিরক্ষা জোটকে প্রস্তুত হতে হবে বলে সম্প্রতি সতর্ক করেছেন নেটোর ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল মিরচা জুয়ানা। অর্থাৎ এ যুদ্ধ যে সহসা বন্ধ হচ্ছে না তা এখন স্পষ্ট। বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতিতে এর প্রভাবে দ্রব্যমূল্য ও জালানিসহ সবকিছুর দাম দিন দিন বেড়েই চলেছে। দরিদ্র মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। এর মধ্যে জার্মানিতে পশ্চিমা ৪০ টি দেশের বৈঠকে জার্মানি ইউক্রেনে ভারি অস্ত্র সরবরাহের ঘোষণা দেওয়ার পর রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সংকেত দিলেন। তাহলে রাশিয়া কি সত্যি সত্যি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিকল্পনা নিয়েই এগুচ্ছে? আর তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে দক্ষিণ এশিয়ার দেশ বাংলাদেশসহ বিশ্ব অর্থনীতিতে কী প্রভাব পড়তে পারে?

নেটো সম্প্রতি যে ধরনের অস্ত্র ইউক্রেনকে দিচ্ছে বা দেয়ার পরিকল্পনা করছে, তা শুধু ইউক্রেনের

আত্মরক্ষার জন্য নয়, এসব অস্ত্র দিয়ে রাশিয়ার অভ্যন্তরেও আঘাত করা যাবে। ইতোমধ্যে রাশিয়ার অভ্যন্তরে বেশ কয়েকবার হামলা চালানো হয়েছে, যার দায় রাশিয়া ইউক্রেনের উপরই দিয়েছে। মি. পুতিন অত্যন্ত স্পর্শকাতর অস্ত্রশস্ত্র ইউক্রেনে না পাঠানোর জন্য পশ্চিমের দেশগুলোকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন পশ্চিমা বিশ্ব এই যুদ্ধে নাক গলালে তার পরিণতি হবে ভয়াবহ এবং নজিরবিহীন। কিন্তু আমেরিকা বা নেটো এই হুমকি সেভাবে আমলে নিয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। বিশ্ব অর্থনীতির ওপর যুদ্ধের প্রভাব তো ইতোমধ্যেই পড়তে শুরু করেছে। ইউরোপে তেলের দাম এক-তৃতীয়াংশ বেড়ে গেছে এবং গ্যাসের দাম বেড়েছে প্রায় অর্ধেক। ইউরোপ প্রাকৃতিক গ্যাস ও জ্বালানী তেলের উপর যেমন রাশিয়ার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল তেমনি গম, ভুট্টা ও সূর্য্যমুখী তেলের উপরও ইউক্রেন ও রাশিয়ার উপর নির্ভরশীল। কৃষিতে যে সার প্রয়োগ করা হয় তার অন্যতম মূল উপাদান পটাশ ও ফসফেটের বড় একটা অংশ আমদানি করা হয় রাশিয়া থেকে। কাজেই এ যুদ্ধ আরও ছড়িয়ে পড়লে অর্থনীতিতে যে তার বিপর্যয়কর প্রভাব পড়বে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লিজ ট্রাস বুধবার স্পষ্ট করে বলেছেন রাশিয়াকে ইউক্রেনের প্রতিটি ইঞ্চি জায়গা ছাড়তে হবে, এমনকি ক্রাইমিয়াও ছাড়তে হবে।

নেটো জোটের সদস্য এস্তোনিয়ার প্রধানমন্ত্রী কায়া কালাস শুক্রবার একই কথা বলেছেন। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কিও এখন বারবার জোর গলায় বলছেন রাশিয়াকে তিনি এক ইঞ্চি জমিও ছাড়বেন না। যুক্তরাষ্ট্র এবং তার বেশ কিছু নেটো শরিক দেশের মধ্যে এই মনোভাব জোরদার হচ্ছে যে রাশিয়াকে এই যুদ্ধে হারাতে হবে, এবং তারা মনে করছে ইউক্রেনকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করলে সেটা সম্ভব। অর্থাৎ এ যুদ্ধ এখন আর রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, এ যুদ্ধ এখন রাশিয়ার সাথে পশ্চিমাদের যুদ্ধ। জোর সম্ভাবনা রয়েছে এর ব্যাপকতা বাড়ার এবং এর আওতা যদি উইক্রেন সীমান্ত ছাড়িয়ে অন্য কোনো দেশে ঢুকে পড়ে তাহলে ধরেই নেওয়া যায় যে, সেটা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধেরই সূচনা ঘটাবে। আর এ সম্ভাবনা এখন একেবারে অবান্তর নয়।

সম্প্রতি কিয়েভে এক সফর শেষ করে পোল্যান্ডে ফিরে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী জেনারেল লয়েড অস্টিন খোলাখুলি বলেছেন শুধু এই যুদ্ধে পরাজয় নয়, রাশিয়ার সামরিক শক্তি পাকাপাকিভাবে দুর্বল করে দেওয়াই এখন আমেরিকার মূল লক্ষ্য। জেনারেল অস্টিনের এই বক্তব্যের পরদিন ক্ষুব্ধ রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ বলেছেন নেটো জোট এখন রাশিয়ার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। পরদিন রাতে রুশ টিভি চ্যানেল রাশিয়া ফার্স্টে এক সাক্ষাৎকারে মি লাভরভ বলেন, আমেরিকা এবং নেটো জোট যদি ইউক্রেনকে ঢালাওভাবে অস্ত্র দেওয়া বন্ধ না করে তাহলে একটি পারমানবিক সংঘাত এবং তার জেরে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতে পারে। তিনি বলেন, "এমন ঝুঁকি এখন খুবই বাস্তব একটি সম্ভাবনা, সেই ঝুঁকি এখন অনেক অনেক বেশি।"

এদিকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে বলে জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। বুধবার এনবিসিনিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা বলেন। খবর ডেইলি মেইলের। আর রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন কোনো দেশ ইউক্রেন যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করলে তাকে সমুচিত জবাব দেওয়া হবে। তিনি বলেছেন, আমাদের সব ধরনের উপকরণ আছে। দরকার হলে আমরা তা ব্যবহার করব। বুধবার সেন্ট পিটার্সবার্গে রাশিয়ান আইনপ্রণেতাদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ মন্তব্য করেন।

পুতিন বলেন, কেউ যদি বাইরে থেকে ইউক্রেনে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করে ও রাশিয়ার জন্য কৌশলগত হুমকি সৃষ্টি করে, তাহলে আমরা বিদ্যুৎ গতিতে জবাব দেব। ইউক্রেনে রুশ অভিযানের নির্দেশ দিয়েও একই ধরনের হুমকি দিয়েছিলেন পুতিন। এমনকি পরমাণু অস্ত্রকে সতর্ক অবস্থায় রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পুতিনের এসব হুঁশিয়ারির পর ইউরোপের অন্য দেশেও যুদ্ধ ছড়ানোর আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

এ যুদ্ধে কোনোভাবে ব্যর্থতা আসলে ইমেজ সঙ্কটে পড়বেন পুতিন, কোনোভাবে এ যুদ্ধে তিনি পরাজিত হলে তার সরকারের পতন হবার বিরাট সম্ভাবনাও রয়েছে। তাছাড়া এ যুদ্ধে পুতিনের পরাজয় মানে ইউক্রেন ন্যাটোভুক্ত হওয়া এবং মস্কোর কাঁধের উপর নিঃস্বাস ফেলবে ন্যাটো ও মার্কিন সৈন্য। রাশিয়াকে ন্যাটো ঘিরে ফেলবে, ন্যাটোর প্রভাব বেড়ে যাওয়ায় পূর্ব ইউরোপের বাকি রাষ্ট্রগুলোও ন্যাটোভুক্ত হওয়ার জোর সম্ভাবনা তৈরি হবে। কাজেই পুতিন এ যুদ্ধ থেকে কোনোভাবেই ফিরতে পারবেন না।

নিউইয়র্ক টাইমসের এক খবরে বলা হয়েছে, মাত্র ৯ সপ্তাহ আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছিলেন, তিনি ইউক্রেন যুদ্ধকে ইউক্রেনের সীমানার মধ্যেই রাখতে চান। কিন্তু ওয়াশিংটন ও ইউরোপের রাজধানীগুলোতে আশঙ্কা বাড়ছে যে, এই যুদ্ধ আরো বিস্তৃত হতে পারে। প্রতিবেশী দেশেও ছড়াতে পারে।

এ যুদ্ধকে বিশ্ববাসী যেভাবেই দেখুক না কেন রাশিয়ার জনগণের কাছে ভ্লাদিমির পুতিনের জনপ্রিয়তা আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে, সে দেশের জনগণের কাছে পুতিন এখন রীতিমতো হিরো। যুদ্ধের শুরুর দিকে পশ্চিমাদের অবরোধের ফলে রাশিয়ান মুদ্রা রুবলের দরপতন হয়, ফলে রাশিয়ার অভ্যন্তরে কিছুটা অস্বস্তি তৈরি হয়। কিন্তু পশ্চিমাদের অবরোধের বিপরীতে পুতিন ইউরোপীয় দেশগুলোকে বাধ্য করে রুবলের মাধ্যমে তেল-গ্যাস কিনতে যা রুবলের অবমূল্যায়ন ঠেকিয়ে এর মান উর্ধ্বমুখী করে দেয়, তেল ও গ্যাস থেকে মস্কোর আয় পূর্বের চেয়ে আরও বেড়ে যায়। যার ফলে পুতিনের জনপ্রিয়তাও আরও বৃদ্ধি পায়।

এ যুদ্ধে কোনোভাবে ব্যর্থতা আসলে ইমেজ সঙ্কটে পড়বেন পুতিন, কোনোভাবে এ যুদ্ধে তিনি পরাজিত হলে তার সরকারের পতন হবার বিরাট সম্ভাবনাও রয়েছে। তাছাড়া এ যুদ্ধে পুতিনের পরাজয় মানে ইউক্রেন ন্যাটোভুক্ত হওয়া এবং মস্কোর কাঁধের উপর নিঃস্বাস ফেলবে ন্যাটো ও মার্কিন সৈন্য। রাশিয়াকে ন্যাটো ঘিরে ফেলবে, ন্যাটোর প্রভাব বেড়ে যাওয়ায় পূর্ব ইউরোপের বাকি রাষ্ট্রগুলোও ন্যাটোভুক্ত হওয়ার

জোর সম্ভাবনা তৈরি হবে। কাজেই পুতিন এ যুদ্ধ থেকে কোনোভাবেই ফিরতে পারবেন না।

আবার পশ্চিমারা যেভাবে আটঘাট বেঁধে নেমেছে, তাতে তাদের জন্যও এ যুদ্ধে পরাজয় বিরাট একটা প্রেসটিজ ইস্যু। শুধু তাই নয়, ইউক্রেনের পরাজয় পুতিনকে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে, তাকে ইউক্রেনের বাইরে পূর্ব-ইউরোপের অন্যান্য দেশেও আগ্রাসন চালাতে প্ররোচিত করবে। ফলে পশ্চিমারাও এ যুদ্ধে পুতিনকে পরাজিত করতে সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকবে। তবে কি এ যুদ্ধ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধেই রূপ নেবে? অবস্থাদৃষ্টে সেটাই প্রতীয়মান হচ্ছে।

যুদ্ধ, মহাযুদ্ধ, অর্থনীতিক মন্দা, ক্ষুধা, দারিদ্র, বেকারত্ব এগুলোর সাথেই আসে সামাজিক অস্থিতিশীলতা, নিরাপত্তাহীনা, চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি। রাষ্ট্রগুলো তাদের আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যর্থ হবে। একটা শ্রেণি ক্ষুধার তাড়নায় চুরি করবে, ডাকাতি করবে, মানুষ খুন করবে আর আরেকটা শ্রেণি তাদের বিলাসী জীবনের উপকরণের যোগান ঠিক রাখতে মাদকব্যবসা, পণ্যে ভেজাল, নারী ও শিশু পাচার ইত্যাদি অবৈধ কাজে লিপ্ত হবে। এক কথায় সামনে ভয়ানক এক পরিস্থিতি সৃষ্টি হবার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। তাহলে এ অবস্থায় আমাদের করণীয় কী?

একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে, যখন বড় ধরনের সঙ্কট সৃষ্টি হয়, যুদ্ধ-মহাযুদ্ধ লাগে, অভাব-অনটন, দুঃখ-দারিদ্র নেমে আসে তখন পুরোনো ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে এবং নতুন ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। দেশে-দেশে, জাতিতে জাতিতে বহু পরিবর্তন আসে। এখন এই পরিবর্তন ইতিবাচক হবে নাকি নেতিবাচক হবে সেটা নির্ভর করে কারা এই পরিবর্তনের পেছনে হাল ধরবে তার উপর। কাজেই এখন সেই পরিবর্তনের সময়। আমরা যদি সমাজের একটা ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটাতে চাই তাহলে এই মুহূর্তে আমাদেরকে সত্যের উপর, ন্যায়ের উপর, কলেমার উপর, তওহীদের উপর ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আমরা যদি বাঁচতে চাই তাহলে উপায় এখন একটাই আর তা হলো- সকল দল-মত, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। কারণ ঐক্যবদ্ধ জাতি তাদের জাতীয় স্বার্থে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে এবং সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে জোর চেষ্টা চালাতে পারে। কিন্তু জাতি যদি ঐক্যবদ্ধ না থাকে তবে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণই সম্ভব নয়। অনেকেই বলতে পারেন এত দল-মত, জাতি-ধর্মের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব নয়। কিন্তু এটা বলার সময় এখন না, এখন অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে। এখন বাঁচার জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সকল ন্যায় ও সত্যের পক্ষে, যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আমরা অন্তত বাঁচার চেষ্টা করি। আমরা যদি সত্যের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হই তবে স্রষ্টাও আমাদের সহায় হবেন কারণ তিনি সত্যনিষ্ঠ (মো'মেন) মানুষের সাথে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মহান আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে বলেছেন, আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করো। তোমরা পরস্পরে ঝগড়া করো না, তাহলে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের প্রভাব প্রতিপত্তি দূর হয়ে যাবে (সুরা আনফাল ৪৬)। জনশক্তি, খনিজ সম্পদ, বিরাট ভূখণ্ড, অসংখ্য সমুদ্র বন্দর, সমুদ্র পথ, পণ্ডিত, আলেম-ওলামা, লেখক-সাহিত্যিক, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি কোনো কিছুর অভাব নেই এই মুসলিম জাতির, কেবল এক শক্তিশালী আদর্শের অভাব যার ভিত্তি হলো তওহীদ। এখন মুসলিম জাতির সর্বপ্রথম কর্তব্য হলো তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়গুলোকে পেছনে রেখে আগে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। রসুলাল্লাহ (সা.) যেমন কলেমা তওহীদের উপর অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম তথা যাবতীয় ন্যায়ের উপর ভিত্তি করে একটি জাতি গঠন করলেন এবং ন্যায়ভিত্তিক একটি সমাজ গড়ে তুললেন সেভাবে এক আল্লাহর হুকুমের উপর মুসলিমদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। জাতি যখন ঐক্যবদ্ধ হবে তখন তারা হবে বিরাট শক্তি। এই শক্তিশালী, ঐক্যবদ্ধ জাতির একজন নেতা থাকবেন, তাঁর কথা সকলে মান্য করবে। তখন তিনি উদ্যোগ নিতে পারবেন জাতিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার। তিনি মহাযুদ্ধের কবল থেকে জাতিকে রক্ষাও করতে পারবেন, জাতিকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখতে পারবেন।

[লেখক: সহকারী সাহিত্য সম্পাদক, হেযবুত তওহীদ;
ইমেইল: opinion.hezbuttawheed@gmail.com,
ফোন: ০১৬৭০১৭৪৬৫১, ০১৬৭০১৭৪৬৪৩,
০১৭১১৫৭১৫৮১]

আন্তর্জাতিক বিশ্লেষণ

ইউক্রেন কি রাশিয়ার জন্য দ্বিতীয় আফগানিস্তান হবে?

আরশাদ মাহমুদ

১৯৭৯ সালে রাশিয়া ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত দেশ। সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন বিশ্বের সুপার পাওয়ার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যার টেক্কা! সোভিয়েতের কাছেও প্রচুর পারমাণবিক বোমা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কাছেও পারমাণবিক বোমা। কেউ কাউকে আক্রমণ করতে পারে না তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ লেগে যাওয়ার ভয়ে, কিন্তু সরাসরি আক্রমণ না করলে কী হবে, উভয়পক্ষই চাইত যে কোনো উপায়ে প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রকে ধ্বংস করে বিশ্বে একক সুপার পাওয়ার হয়ে উঠতে। কীভাবে লাঠি না ভেঙে সাপ মারা সম্ভব, তাই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলতে থাকত উভয় দেশের সামরিক অঙ্গনে।

এমনই পরিস্থিতিতে গত শতাব্দীর আশির দশকে বিশ্ব রাজনীতির রঙ্গমঞ্চ হয়ে উঠেছিল আফগানিস্তান! আফগানিস্তান দেশটি রাশিয়ার প্রতিবেশী এবং ভূরাজনৈতিকভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেশ। সোভিয়েত ইউনিয়ন চাইত আফগানিস্তানে কমিউনিস্ট সরকার ক্ষমতায় থাকুক। এতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভূরাজনৈতিক সুবিধা পাবে। সঙ্গত কারণেই যুক্তরাষ্ট্রের চাওয়া ছিল বিপরীত। দেশটি চাইত আফগানিস্তানে আর যাই হোক কমিউনিস্ট সরকার যেন কায়েম হতে না পারে। এখনকার ইউক্রেনের মতোই ছিল ব্যাপারটা। রাশিয়া চাইছে ইউক্রেনে রুশ-মদদপুষ্ট সরকার ক্ষমতায় বসাতে, অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র চাইছে ইউক্রেনে রুশবিরোধী জেলেনস্কি সরকারকে ক্ষমতায় রাখতে। ক্ষমতার এই টানাটানির এক পর্যায়ে রাশিয়া যেমন ইউক্রেনে সেনা পাঠিয়েছে, একইভাবে ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে সোভিয়েত ইউনিয়ন সেনা পাঠিয়েছিল আফগানিস্তানে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন সেনা পাঠায়, সামরিক কর্মকর্তারা ভেবেছিল তাদের সেনারা আফগানিস্তানে থাকবে মাত্র ছয় মাস। তারা ঘুনাক্ষরেও ভাবেনি- ছয় মাস নয়, এমনকি ছয় বছরেও ওই যুদ্ধের শেষ হবে না। বস্তুত তারা সেদিন দশ বছরের এমন একটি যুদ্ধের জন্ম দিয়েছিল যা সোভিয়েত ইউনিয়নকেই ভেঙে টুকরা টুকরা করে ফেলেছিল।

আসলে আফগানিস্তানের মুসলিমপ্রধান জনগোষ্ঠীর কাছে সোভিয়েত ইউনিয়নের ও কমিউনিজমের গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। তা সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতারাও বুঝতেন। তারা চেয়েছিলেন সামরিক শক্তি খাটিয়েই আফগানিস্তানে কমিউনিস্ট সরকার টিকিয়ে রাখতে। হয়ত ভেবেছিলেন- বিশাল সামরিক শক্তিসম্ভারের বিপরীতে নিরীহ গোবেচারা আফগানরা কি আর টিকে থাকতে পারবে! ঠিকই বশ্যতা মেনে নিতে বাধ্য হবে। কিন্তু ইতিহাস সে পথে গেল না।

পুতিনের ইউক্রেন আক্রমণের ঘটনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেমন শুরুতেই তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা থেকে বিরত থাকে, ১৯৭৯ সালেও তেমনটাই ঘটেছিল। শুরুতেই প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের শিবিরে চলছিল সামরিক ও নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ, জেনারেল, গোয়েন্দা কর্মকর্তা ও সরকারের দফায় দফায় বৈঠক। বৈঠকে উঠে আসছিল একের পর এক প্রস্তাবনা। কী করা যেতে পারে? আফগানিস্তানের মত গুরুত্বপূর্ণ ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণ সোভিয়েতের হাতে চলে গেলে মুশকিল, আবার সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সরাসরি কোনো সামরিক পদক্ষেপ নিলে কুরুক্ষেত্র বেধে যাবে। সময়টা স্নায়ুযুদ্ধের- তা আগেই বলে এসেছি। কাজেই মার্কিন সেনাকে সোভিয়েত সেনার মুখোমুখী দাঁড় করানো যাবে না- এই নীতি ঠিক রেখে যা কিছু করা যায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে তা করতে হবে।

সিআইএ'র ধূর্ত অফিসাররা যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সমন্বয় কমিটির কাছে আফগানিস্তানে গুপ্ত অভিযান পরিচালনার বেশ কয়েকটি পথ তুলে ধরলেন। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত রাখলেন মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি ওয়াল্টার স্লোকাম্বে। তিনি প্রস্তাব রাখলেন "সোভিয়েত ইউনিয়নকে আফগানিস্তানের মাটিতে আটকে ফেলতে হবে।" সম্ভবত ওয়াল্টার স্লোকাম্বের ওই প্রস্তাবটিই যুক্তরাষ্ট্রের নীতি নির্ধারকরা গ্রহণ করেছিলেন, যা পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে স্পষ্ট বোঝা যায়।

আসলে আফগানিস্তানের মুসলিমপ্রধান জনগোষ্ঠীর কাছে সোভিয়েত ইউনিয়নের ও কমিউনিজমের গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। তা সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতারাও বুঝতেন। তারা চেয়েছিলেন সামরিক শক্তি খাটিয়েই আফগানিস্তানে কমিউনিস্ট সরকার টিকিয়ে রাখতে। হয়ত ভেবেছিলেন- বিশাল সামরিক শক্তিসম্ভারের বিপরীতে নিরীহ গোবেচারা আফগানরা কি আর টিকে থাকতে পারবে! ঠিকই বশ্যতা মেনে নিতে বাধ্য হবে। কিন্তু ইতিহাস সে পথে গেল না।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে শুরু করল প্রক্সিযুদ্ধ। আফগানদের ধর্মীয় চেতনা ব্যবহার করার জন্য সৌদি আরব, পাকিস্তান, মিসর ইত্যাদি দেশের সহায়তায় আফগানিস্তানে "মুজাহিদ বাহিনী" গড়ে তোলা হলো, যাদের অস্ত্রপাতি সরবরাহের দায়িত্ব নিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সিআইএ, প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নিল পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই, আর অর্থ সরবরাহের দায়িত্ব পড়ল মধ্যপ্রাচ্যের তেলসমৃদ্ধ আরব রাষ্ট্রগুলোর উপর। মুসলিম বিশ্বে জেহাদের জোশ উঠিয়ে দিলেন আরব প্রভাবাধীন ধর্মীয় নেতারা। শুরু হলো আফগানিস্তানের জেহাদ। একদিকে বিশ্বের সুপার পাওয়ার সোভিয়েত সেনাদের অত্যাধুনিক অস্ত্রপাতি, ট্যাংক, যুদ্ধবিমান, আরেকদিকে হাজার হাজার আফগান মুজাহেদিনের জেহাদী জোশ। এই মুজাহেদিনরা আমেরিকার স্বার্থে রক্ত দিলেও পরবর্তীতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের চরম শত্রু হয়ে উঠেছিল ও "জঙ্গি" তকমা পেয়েছিল, তবে তার আগেই তাদের ঈমানী চেতনা ব্যবহার করে কাজের কাজটি আমেরিকা ঠিকই উসুল করে নিয়েছিল। দীর্ঘ দশ বছর আফগান মোজাহেদিনদের ব্যবহার করে সোভিয়েত সেনাদের ব্যস্ত রাখা হয়েছিল আফগানিস্তানের মাটিতে। এত দীর্ঘ সময়ের যুদ্ধের ব্যয় মেটাতে না পেরে এবং যুদ্ধে বিজয়ী হতে না পারার আনুষঙ্গিক ক্ষয়ক্ষতি সামলাতে না পেরে সোভিয়েত ইউনিয়নের সেনারা আফগানিস্তান থেকে কেবল পশ্চাৎপসরণই করল না, কিছুদিন না যেতেই ভেঙেই পড়ল সোভিয়েত ইউনিয়ন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা সফল হলো, যদিও তার জন্য চরম মূল্য দিতে হয়েছে আফগানিস্তানের জনগণকে ও মুসলিম জাতিকে। আজও সেই মাসুল দিতে হচ্ছে 'জঙ্গিবাদ' ইস্যুতে।

প্রশ্ন হচ্ছে, সোভিয়েত নেতারা যে ভুলটা করেছিলেন সেই একই ভুল কি এবার পুতিন করলেন ইউক্রেনে আক্রমণ চালিয়ে? ইউক্রেন কি হয়ে উঠবে রাশিয়ার দ্বিতীয় আফগানিস্তান?

আফগানিস্তানের জনগণ যেমন রুশ শাসনকে পছন্দ করত না, তেমনি ইউক্রেনের জনগণও রুশ আধিপত্য মানতে চায় না। সোভিয়েত নেতারা যেমন আফগানিস্তানে সেনা পাঠিয়েছিল, পুতিনও সেভাবেই সেনা পাঠিয়েছেন ইউক্রেনে। আফগান যুদ্ধ যেমন সহজে শুরু হলেও সহজে শেষ করা যায়নি, পুতিনও কিন্তু পারছেন না ইউক্রেন অভিযান শেষ করতে।

বরং শুরুতে যতটা কঠিন মনে হয়েছিল, এখন মনে হচ্ছে তারচেয়েও কঠিন পরিস্থিতিতে পড়েছেন পুতিন সেনারা। কেননা যুক্তরাষ্ট্রসহ পুরো ন্যাটো জোট অস্ত্র, অর্থ ও গোয়েন্দা তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করছে ইউক্রেনকে। গুঞ্জন রয়েছে, ন্যাটোর পক্ষ থেকে শুধু অত্যাধুনিক অস্ত্রই নয়, অস্ত্র চালাবার দক্ষ সৈন্যও পাঠানো হচ্ছে ইউক্রেনে। এভাবে শীতল যুদ্ধের দিনগুলোতে আফগানিস্তানের জমি

সামরিক বিশ্লেষকরা আশঙ্কা করছেন- দিনদিন পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যাবে এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে অস্ত্র সরবরাহ অব্যাহত রেখেছে, তাতে সহিংসতা আরও বাড়তে থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তাহলে পুতিনও কি সেই গর্তেই পা দিলেন, যে গর্তে পা দিয়ে সর্বনাশ ডেকে এনেছিলেন সোভিয়েত নেতারা? এখন পুতিন সামনে এগোতে চাইলে আরও জোরালো অভিযান চালাতে হবে, ব্যয় হবে আরও লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা। এতবড় ধাক্কা সামাল দেওয়ার মতো অর্থনীতি কি পুতিনের আছে?

ও মুসলিমদের ধর্মানুভূতিকে ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্র যেমন সোভিয়েতের সঙ্গে ছায়াযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল, ইউক্রেনেও একইভাবে আরেকটি ছায়াযুদ্ধের সূচনা হয়েছে সেই দুটো পরাশক্তিধর রাষ্ট্রের মধ্যেই।

এদিকে রাশিয়ার উপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা তো ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে শুরুতেই। সামরিক বিশ্লেষকরা আশঙ্কা করছেন- দিনদিন পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যাবে এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে অস্ত্র সরবরাহ অব্যাহত রেখেছে, তাতে সহিংসতা আরও বাড়তে থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তাহলে পুতিনও কি সেই গর্তেই পা দিলেন, যে গর্তে পা দিয়ে সর্বনাশ ডেকে এনেছিলেন সোভিয়েত নেতারা? এখন পুতিন সামনে এগোতে চাইলে আরও জোরালো অভিযান চালাতে হবে, ব্যয় হবে আরও লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা। এতবড় ধাক্কা সামাল দেওয়ার মতো অর্থনীতি কি পুতিনের আছে? হয়ত আছে বা হয়ত নেই। তবে যাই হোক, পুতিন পিছিয়ে আসতেও পারবেন না। তার পিছিয়ে আসাটাই পরাজয় হয়ে দেখা দিবে এবং তাকে ভালোভাবেই পেয়ে বসবে পশ্চিমা জোট।

তবে এখানে কথা আছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন আর রাশিয়ার পতন সমান কথা নয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল একটি জোট। তা ভেঙে গেছে, সেই সঙ্গে ভেঙে গেছে কমিউনিজমের স্বপ্ন। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো ধ্বংস হয়ে যায়নি। দেশগুলো পেয়েছে স্বাধীনতা। কিন্তু রাশিয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা হবে ভিন্ন। রাশিয়া যদি সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে ভেঙে পড়ে, তাহলে জনগণ স্বাধীনতা পাবে না, বরং স্বাধীনতা হারাবে। আর তীব্র আর্থিক দুর্দশা তৈরি হবে সারা দেশে। সুপার পাওয়ার হিসেবে নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ করার যে অভিলাস রাশিয়ার ছিল, তা মাটির সঙ্গে মিশে যাবে। সমস্যা হলো- রাশিয়ার স্বপ্ন যদি কোনোদিন মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়, তাহলে নেতারা কী করবেন তার আগাম হুমকি দিয়ে রাখা হয়েছে। আর তা নিয়েই যত ভয়। প্রেসিডেন্ট পুতিন ও তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ বারবার বলেছেন সঙ্কটে পড়লে পরমাণু বোমা হামলা হবে। রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরো খোলাখুলিভাবে বলেছেন, পশ্চিমারা ইউক্রেনের কাছে অস্ত্রের চালান পাঠালে রাশিয়া সেখানে হামলা করার অধিকার রাখে। এই সংঘাত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে রূপ নিতে পারে বলেও তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন। কেউ বলছেন- এই হুমকি কেবলই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে দেওয়া হচ্ছে, বাস্তবে কখনই তা ঘটবে না। আবার কেউ বলছেন- ঘটতেও পারে। রাশিয়া যে ইউক্রেন আক্রমণ করবে, এত স্থূল যুদ্ধ শুরু করবে, সেটাও তো অচিন্তনীয় ছিল। তাই বলে কি ঘটেনি?

এ যেন উভয়সঙ্কটে পড়েছে পশ্চিমা জোট। রাশিয়া জিতলেও ভয়, হারলেও ভয়। রাশিয়া জিতলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একক আধিপত্যে টান পড়বে। রাশিয়া-চীন নতুন অক্ষশক্তি গড়ে উঠবে। আবার রাশিয়া হারলে বা অস্তিত্ব সঙ্কটে পড়লে পরমাণু বোমা হামলা করতেও দ্বিধা করবে না। যার পরিণতি হবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এক্ষেত্রে আবার সঙ্কট শুধু পশ্চিমা জোটের না। সঙ্কট হয়ে দাঁড়াচ্ছে পুরো মানবজাতিরই।

[লেখক: কলামিস্ট]

মুসলিম উম্মাহর অনৈক্যের কারণ ও সমাধানের পথ

মো. রিয়াদুল হাসান

কথা ছিল এক আল্লাহ, এক রসুল, এক কেতাব, এক কেবলার অনুসারী মুসলমান হবে এক জাতি। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য! আজকে পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে থাকা প্রায় ১৮০ কোটি মুসলমান আজকে হাজার হাজার ভাগে খণ্ড-বিখণ্ড। তারা রাজনৈতিকভাবে পঞ্চান্নটির মত ভৌগোলিক রাষ্ট্রে, দীনের ব্যাখ্যায় বহু মযহাবে ও ফেরকায়, আধ্যাত্মিকভাবে শত শত তরিকায় এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার নকল করে হাজার হাজার রাজনৈতিক দলে ছিন্নবিছিন্ন। এই অনৈক্যের কারণগুলো আজকে আমরা বিশ্লেষণ করব।

তওহীদ হচ্ছে এই ঘোষণা দেওয়া যে আমরা আমাদের জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে একমাত্র আল্লাহর হুকুম মেনে চলব; যে বিষয়ে আল্লাহর হুকুম আছে সে বিষয়ে আর কারো হুকুম মানব না। বর্তমানে পৃথিবীর এক ইঞ্চি মাটিতেও এই তওহীদ অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত নেই।

• ঐক্যসূত্র তওহীদ

ঐক্যই শক্তি। বিভক্তি মানেই পরাজয়। মুসলমান জাতি তাদের ঐক্যের শক্তি দিয়ে বিশ্ববিজয়ী জাতিতে পরিণত হয়েছিল। কীসের উপর ঐক্য? তাদের ঐক্যের ভিত্তিই ছিল আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বা তওহীদ। সার্বভৌমত্ব মানে হচ্ছে যার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। আজকে পাশ্চাত্য সভ্যতা যা বলে যা শেখায় সেটাই চূড়ান্ত সেটা কী মুসলিম দেশে, কী অমুসলিম দেশে। তওহীদ বা কলেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-মোহাম্মাদুর রসুলাল্লাহ (সা.) হচ্ছে মুসলিম জাতির ঐক্যসূত্র।

একটা তসবিহর দানাগুলো মালার আকারে ঐক্যবদ্ধ থাকে কারণ দানাগুলোর ভিতর দিয়ে একটি সুতা প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। এই সুতাই হচ্ছে দানাগুলোর ঐক্যসূত্র। এই সূত্র বা সুতা কেটে দিলে তসবিহ বা মালার দানাগুলো সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাবে। একইভাবে প্রত্যেক মুসলমানের মধ্যে তওহীদের অঙ্গীকার হচ্ছে সেই ঐক্যসূত্র যা তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ রাখার কথা ছিল। জাতি যখন তার জাতীয় জীবনে, রাজনীতিতে, শিক্ষাব্যবস্থায়, আইন-আদালত, প্রশাসন পরিচালনা, বিচার-আদালতে আল্লাহর হুকুমগুলোর পরিবর্তে ব্রিটিশদের তৈরি করা হুকুম-বিধানগুলো গ্রহণ করে নিল আর আল্লাহকে কেবল উপাসনা-আরাধনা, তাসবিহ-তাহলিল, জিকির আজকারের জায়গায় রেখে দিল, তখন তারা তওহীদ বা কলেমার অঙ্গীকার থেকে বেরিয়ে গেল। আর তওহীদ থেকে বেরিয়ে গেলে কোনো জাতি আর মুসলিম থাকতে পারে না, এ জাতিও তা নেই।

• জাতির লক্ষ্যের ঐক্য

যারা তওহীদের স্বীকৃতি দিবে, কলেমায় থাকবে তারা অন্য কোনো বিষয় নিয়ে জাতির মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করতে পারে না। হানাফি, হাম্বলি, মালেকি, শাফেয়ি, সুন্নী, শিয়া ইত্যাদি হাজারো ভাগে বিভক্ত মুসলিমরা যদি ভাবতেন যে অন্যান্য ফেরকা-মাজহাবের লোকেরাও তাদের মতোই কলেমা, তওহীদে বিশ্বাসী, তাদের সঙ্গে অনৈক্য করা 'কুফরি' তাহলে এ জাতির মধ্যে শরিয়াহগত বা ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল ইত্যাদি আমলের প্রক্রিয়াগত বিষয়ে মতভেদের দরুন সৃষ্ট কোনো ফেরকা মাজহাবের অস্তিত্ব থাকত না। এখনও যদি এ জাতিকে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বা তওহীদের মূল বাণীর উপর ঐক্যবদ্ধ করা যায় তাহলে ১৮০ কোটির জাতি আবারও এক জাতিতে পরিণত হবে। এই ঐক্যবদ্ধ শক্তিই তাদের বিজয়ী জাতিতে পরিণত করবে।

তওহীদের উপর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পর প্রয়োজন সেই জাতিকে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের পানে ধাবিত করা। প্রত্যেক জাতি সৃষ্টির নিশ্চয়ই একটি লক্ষ্য থাকে। উম্মতে মোহাম্মদী জাতিটিকে সৃষ্টির লক্ষ্য কী ছিল? সেটা হচ্ছে, সর্বাত্মকভাবে সংগ্রাম (জেহাদ) করে আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থাকে সমগ্র পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করা। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই রসুলাল্লাহ মানুষকে তওহীদের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করে একটি সুশৃঙ্খল ও সংগ্রামী জাতির রূপ দান করেছিলেন। ইসলামকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করতে আল্লাহ যে নীতি রসুলকে দিয়েছেন সেই নীতির উপর ভিত্তি করা একটি ৫ দফা কর্মসূচি আল্লাহ তাঁর রসুলকে দান করলেন। এই ৫ দফা কর্মসূচি তিনি তাঁর উম্মাহর উপর অর্পণ করার সময় বললেন– আল্লাহ আমাকে পাঁচটি কাজের আদেশ দিয়েছেন, (আমি সারাজীবন এই কর্মসূচি

অনুযায়ী সংগ্রাম করেছি) এখন সেই পাঁচটি কাজ আমি তোমাদের উপর অর্পণ করছি। সেগুলো হল:

১. (১) ঐক্যবদ্ধ হও।
২. (নেতার আদেশ) শোন।
৩. (নেতার ঐ আদেশ) পালন কর।
৪. হেজরত কর।
৫. (এই দীনুল হককে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার জন্য) আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ কর।

যে ব্যক্তি (কর্মসূচির) এই ঐক্যবন্ধনী থেকে এক বিঘত পরিমাণও বহির্গত হল, সে নিশ্চয় তার গলা থেকে ইসলামের রজ্জু খুলে ফেলল- যদি না সে আবার তওবা করে ফিরে আসে এবং যে ব্যক্তি অজ্ঞানতার যুগের কোনও কিছুর দিকে আহ্বান করল, সে নিজেকে মুসলিম বলে বিশ্বাস করলেও, নামায পড়লেও এবং রোযা রাখলেও নিশ্চয়ই জাহান্নামের জ্বালানি পাথর হবে [আল হারিস আল আশয়ারী (রা.) থেকে আহমদ, তিরমিযি, বাব উল এমারাত, মেশকাত]।

এভাবে জাতির প্রতিটি সদস্যকে রসুলাল্লাহ একজন নেতার নেতৃত্বে তওহীদের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ থাকা, নেতার আদেশ শোনার জন্য সর্বদা মনোযোগী, সজাগ, সতর্ক (Attention) হয়ে থাকা, আদেশ পাওয়ামাত্র সৈনিকের ন্যায় সেই আদেশ প্রতিপালন করা, সকল প্রকার অন্যায়, অসত্য, শেরক কুফরকে বয়কট করা এবং নিজেদের জীবন-সম্পদ, মেধা, যোগ্যতা সবকিছু উজাড় করে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য আমৃত্যু লড়াই করে যাওয়ার স্বভাব ও গুণাবলী শিক্ষা দিলেন। জাতি যতদিন এই কর্মসূচি ধারণ করেছিল ততদিন তারা একজন নেতার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ ছিল। যতদিন জাতির সামনে তাদের লক্ষ্য অটুট ছিল, জাতি একদেহ একপ্রাণ হয়ে দীন প্রতিষ্ঠার জেহাদ চালিয়ে গেল। অকল্পনীয় অল্প সময়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পরাশক্তিধর জাতিতে পরিণত হলো।

খ্রিষ্টান ইতিহাসবিদ জন হার্শ তার ঞযব জড়ষব of Culture in the Creation of Islamic Law গ্রন্থে ইসলামের প্রাথমিক যুগের এই বিস্ময়কর দ্রুততায় সম্প্রসারণ সম্পর্কে লিখেছেন, "মোহাম্মদ (সা.) ৬১০ সালে আল্লাহর কাছ থেকে প্রথম ওহী প্রাপ্ত হন। তিনি প্রধানত তাঁর গোত্রের লোকদের দ্বারা হয়রানি ও নিপীড়নের শিকার হয়ে নব্যুয়তের ১৩ বছর পর তার জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করেন। তিনি সফলতার সাথে মদীনার তিনটি শাসকশ্রেণিকে ইসলামের ছায়াতলে ঐক্যবদ্ধ করেন। এর ১০ বছর পর তিনি এন্তেকাল করেন। কিন্তু এরই মধ্যে তাঁর নেতৃত্বে মুসলিমরা আরব উপদ্বীপ অধিকার করে নেয়। তাঁর এন্তেকালের মাত্র ৯ বছরের মধ্যে মুসলিম বাহিনী বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যের হাত থেকে মিশর, সিরিয়া ইত্যাদি ভূখণ্ড এবং পারস্য সাম্রাজ্যকে পরাভূত করে নিজেদের শাসনের অধীনে নিয়ে আসে। অভাবনীয়ভাবে মাত্র ১০০ বছরের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকায় ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং সামরিকক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। ৭৫০ সালে মুসলিম বাহিনী তদানীন্তন ফ্রাঙ্ক অঞ্চল দখল করে যা বর্তমানে ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত। দখল করে তদানীন্তন বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যের মূল ভূখণ্ড যা বর্তমানে আর্মেনিয়া নামে পরিচিত। দখল করে হিন্দুস্তান নামক এলাকা যা বর্তমানে ভারতীয় উপমহাদেশের অন্তর্ভুক্ত।"

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বিশ্বনবীর ওফাতের ৬০/৭০ বছর পর ইবলিস এই উম্মাহর আকিদায় বিকৃতি ঢুকিয়ে দিতে সমর্থ হল। যার ফলে এই জাতি আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ ও ঐ ৫ দফা কর্মসূচি দু'টোই ত্যাগ করে ইসলাম ও উম্মতে মোহাম্মদী দু'টো থেকেই বহিস্কৃত হয়ে গেল। যাদেরকে তিনি নিজ হাতে দীন শিক্ষা দিয়েছেন, দীনের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, কর্মসূচি শিক্ষা দিয়েছেন সেই মানুষগুলো যখন একে একে দুনিয়া থেকে বিদায় নিল, তখনই প্রকৃত ইসলামের আকিদা হারিয়ে যাওয়া শুরু হল। তাদের পরবর্তী প্রজন্ম অর্ধেক পৃথিবীর শাসনক্ষমতা ও সম্পদের অধিকারী হয়ে নিজেরা নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত সংঘর্ষে এমনভাবে লিপ্ত হয়ে গেল যে, মুসলিম জাতির পরবর্তী ইতিহাকে ভাইয়ে ভাইয়ে কামড়াকামড়ির ইতিহাস বললে অত্যুক্তি হবে না। রসুলাল্লাহর পরলোকগমনের ত্রিশ বছর পরই গোড়াপত্তন হয় উমাইয়া রাজতন্ত্রের। উমাইয়া রাজতন্ত্রের সময় (৬৬১-৭৫০ খ্রি.) অখণ্ড ইসলামি খেলাফতের সীমা সর্বোচ্চে পৌঁছায়। উমাইয়া খিলাফত মোট ৫.৭৯ মিলিয়ন বর্গ মাইল (১,৫০,০০,০০০ বর্গ কিমি.) অঞ্চল অধিকার করে রাখে। তখন পর্যন্ত জাতির রাজনৈতিক নেতা ছিল একজন। কিন্তু শিয়া-সুন্নী বিভক্তি ইতোমধ্যেই ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। জাতির নেতৃত্ব বিশ্বের অন্যান্য সাম্রাজ্যের রাজা-বাদশাহদের মতো বিলাসী জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

এরপর আসে আব্বাসী খেলাফত যা দীর্ঘ ৫০৮ বছর স্থায়ী হয় (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.)। কিন্তু অবাক করা বিষয় হচ্ছে, এই দীর্ঘ সময়ে ইসলামের অধীন ভূখণ্ডের কোনো সম্প্রসারণই ঘটেনি। কারণ কী? কারণ আর কিছু নয়, আল্লাহর রসুল বলেছেন, আমার উম্মাহর বা

জাতির আয়ু ৬০ থেকে ৭০ বছর (আবু হোরায়রা রা. থেকে তিরমিজি, মেশকাত)। অর্থাৎ উম্মাহ গঠন হওয়ার ৬০/৭০ বছর পর এটি তার সৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলবে। যে কাজ করার জন্য জাতিটির উদ্ভব ঘটানো হয়েছিল সেই কাজটিই তারা ত্যাগ করবে, ভুলে যাবে। এর পর আর জাতি হিসাবে তাদের কোনো অস্তিত্বথাকবে না অর্থাৎ জাতি হিসাবে তার মৃত্যু হবে। অপর এক হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে, রসুলাল্লাহ তাঁর ওফাতের এক মাস আগে এশার সালাতের সালাম ফিরিয়ে বললেন, আজকের এই রাতটিকে তোমরা লক্ষ করো। যারা আজ পৃথিবীতে আছে তাদের কেউ আজ থেকে একশ' বছর পর আর বেঁচে থাকবে না। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, এর মর্ম হল বর্তমানের এই যুগটি তখন শেষ হয়ে যাবে (বোখারি, মুসলিম, তিরমিজি)। বাস্তবেও এই সময়টিতেই মুসলিম বিশ্বের সম্প্রসারণ ও অগ্রাভিযান বন্ধ হয়ে যায়।

তওহীদ হচ্ছে এই ঘোষণা দেওয়া যে আমরা

চার মাহজাবের অনুসারীদের জন্য চারটি পৃথক জামাতের স্থান যাকে বলা হত চার ইমামের মাকাম।

আমাদের জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে একমাত্র আল্লাহর হুকুম মেনে চলব; যে বিষয়ে আল্লাহর হুকুম আছে সে বিষয়ে আর কারো হুকুম মানব না। বর্তমানে পৃথিবীর এক ইঞ্চি মাটিতেও এই তওহীদ অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত নেই।

তওহীদ হচ্ছে এই ঘোষণা দেওয়া যে আমরা আমাদের জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে একমাত্র আল্লাহর হুকুম মেনে চলব; যে বিষয়ে আল্লাহর হুকুম আছে সে বিষয়ে আর কারো হুকুম মানব না। বর্তমানে পৃথিবীর এক ইঞ্চি মাটিতেও এই তওহীদ অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত নেই।

জাতি রাজনৈতিকভাবে শত শত রাজ্যে বিভক্ত হয়ে একে অপরের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই চালিয়ে গেছে। শিয়া-সুন্নী শাসকরা একে অপরকে পরাজিত করার জন্য বৈদেশিক শক্তির সঙ্গে আঁতাত করে তাদেরকে ডেকে এনেছে। এভাবে স্পেন ও বাগদাদের মতো পাঁচশ বছর, সাতশ বছরের মুসলিম শাসনের অপমানজনক, দুঃখজনক পতন ঘটেছে ক্রুসেডার, মঙ্গোল ও ইউরোপীয়দের হাতে। সে সময়ে এই লজ্জাজনক পতন ঘটে সে সময়ে মুসলিমরা শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সম্পদের প্রাচুর্যে পৃথিবীর শীর্ষে। যারা মনে করেন, শিক্ষাদীক্ষায় পিছিয়ে পড়ার কারণে আজকে মুসলমান জাতির এত দুর্দশা, যারা শিক্ষাবিস্তারকেই মনে করেন মুসলিম জাতির পক্ষে আবার সম্মানের শীর্ষে ওঠার পথ তাদের জন্য এই ঘটনার মধ্যে চিন্তার খোরাক রয়েছে।

• দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি

আল্লাহর রসুল মাত্র সাড়ে নয় বছরে প্রায় ১০৭ টি সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। এতে প্রতি ৩২ দিনে গড়ে একটি করে অভিযান করতে হয়েছে। এই অভিযানগুলো আয়োজন করতে তাঁর ঐ ছোট্ট জাতিটিকে দিনরাত খেয়ে না খেয়ে পরিশ্রম করতে হয়েছে। তাদের দম ফেলার কোনো অবসর ছিল না। তিনি তাঁর উম্মাহকে জেহাদের মন্ত্রে উদ্দীপ্ত করেছিলেন কোনো সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য নয়। সেটা যদি তাঁর উদ্দেশ্য হতো তাহলে সাড়ে বারো লক্ষ বর্গমাইল এলাকার একচ্ছত্র অধিপতি হয়েও তিনি মাটির ঘরে খেজুর পাতার চাটাইতে ঘুমাতেন না।

মৃত্যুর পূর্বে পুরো জাতিকে তিনি আরব থেকে বাইরে সিরিয়া সীমান্তের মুতা প্রান্তরে যুদ্ধে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তাঁর এন্তেকালের পর আবু বকর (রা.) পাঁচজন সেনাপতির নেতৃত্বে পাঁচ দিকে সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দিলেন। উদ্দেশ্য ছিল মানুষের জীবন থেকে সকল প্রকার অন্যায়, অশান্তি, অবিচার নির্মূল করে দিয়ে সেখানে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শান্তি ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষকে অত্যাচারী শাসকদের শোষণ ও অত্যাচারের হাত থেকে উদ্ধার করে মানবতাকে সমুন্নত করা।

কিন্তু খোলাফায়ে রাশেদুনের পর ধীরে ধীরে জাতির নেতৃত্বের আকিদায় পরিবর্তন আসতে থাকে। তারা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে কিন্তু যুদ্ধের উদ্দেশ্য ন্যায়ভিত্তিক সভ্যতা নির্মাণ থেকে বদলে হয়ে যায় সাম্রাজ্যবিস্তার, সম্পদ লুট ও কর আদায়। অর্থাৎ যে অস্ত্রটি তৈরি করা হলো দুষ্টের দমনের জন্য, সেই অস্ত্রটি ব্যবহৃত হতে লাগল ডাকাতির কাজে। কোনো কোনো উমাইয়া খলিফা অমুসলিমদের প্রদেয় যুদ্ধকর

মুসলিম স্বর্ণযুগের আব্বাসীয় খলিফা হারুন অর রশিদ। যিনি ছিলেন প্রাণচঞ্চল বাগদাদ নগরীর শাসনকর্তা। তাঁর শাসনকালেই বাগদাদ নগরী ঐশ্বর্যের চরমে পৌঁছায়।

বা জিজিয়া প্রদান বন্ধ হয়ে যাবে দেখে ইসলাম গ্রহণ করাই বন্ধ করে দিলেন। এরপর একটা পর্যায়ে এসে সেই রাজ্যবিস্তারের যুদ্ধও পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল।

জেহাদ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর জাতির সদস্যদের হাতে অফুরন্ত অবসর। উমাইয়া খলিফা উমর বিন আব্দুল আজিজ (দ্বিতীয় উমর) আদেশ দিলেন হাদিস সংগ্রহ করতে। শুরু হলো হাদিস সংগ্রহ, হাদিস গবেষণা, সেগুলো থেকে মাসলা ও ফতোয়া নির্গত করা, সেগুলো কেতাবে লিপিবদ্ধ করা। জাতি মেতে উঠল দীনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে। আল্লাহর রসুল যে জাতির হাতে তলোয়ার তুলে দিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠিয়ে পৃথিবীর অভিমুখে বের করে দিয়ে গেলেন, সেই জাতি সেই লক্ষ্য বিস্মৃত হয়ে খাতা-কলম নিয়ে পণ্ডিত (Scholar) হওয়াকেই জীবনের উদ্দেশ্য বানিয়ে নিল। জাতির মধ্যে আর আলি, খালিদ, দেরার, মুসান্না, তারিক, উখবাহ, কা'কা, মোহাম্মদ বিন কাসিমের মত দিগ্বিজয়ী বীর জন্ম নিল না, জন্ম নিতে শুরু করল বিভিন্ন মাজহাবের প্রবক্তা ইমাম, ফকিহ, মুজতাহিদগণ। তারা ব্যক্তিগত বিভিন্ন আমলের চুলচেরা গবেষণা করে ফতোয়া বের করতে লাগলেন।

গড়ে উঠল হাদিস, তাফসির, ফেকাহ, উসুলে ফেকাহর কেতাবের পাহাড়। তাদের এই চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দীনের এমন কোনো বিষয় রইল না যা নিয়ে কোনো মতভেদ নেই। প্রথমে হলো শিয়া-সুন্নী। তারপর সুন্নিরা চার ইমামের ব্যানারে চারটি মাজহাবে বিভক্ত হলো- হানাফি, হাম্বলি, মালেকি, শাফেয়ি। তারপর হল ওয়াহাবি, দেওবন্দী। একেক মাজহাব একেক ইমামের হাদিস সংকলনকে বিশুদ্ধ বলে ঘোষণা করে। হানাফিদের যেমন আছে সিয়াহ সিত্তাহ অর্থাৎ বোখারি, মুসলিম, তিরমিজি, আবু দাউদ, নেসায়ী, ইবনে মাজাহ, তেমনি মালেকি মাজহাবের আছে মুয়াত্তা, হাম্বলি মাজহাবের আছে আহমদ শরিফ। শিয়াদেরও চারটি পৃথক 'বিশুদ্ধ' হাদিসের সংকলন আছে যাকে বলা হয় কুতুব আল-আরবাহ।

শিয়ারা বিভক্ত হলো প্রধান জাফরি, ইসনা-আশ'আরি, ইসমাইলিয়া, যায়েদিয়া, আলাভি, আলানি ইত্যাদি বহুভাগে। সুন্নীদের প্রত্যেক মাজহাবের সালাহ (নামাজ) পড়ার পদ্ধতি পৃথক। একসঙ্গে তাহলে নামাজ পড়বেন কীভাবে? তাদের ইমাম পৃথক, মসজিদ পৃথক হয়ে গেল। মানবজাতির ঐক্যের প্রতীক যে কাবা, সেখানে গিয়েও তারা চার মাজহাব চারটি মিম্বর স্থাপন করলেন, চারটি ভিন্ন জামাতে নামাজ পড়া চালু করলেন। তাদের একটু লজ্জাও লাগল না!

খলিফা নামধারী সুলতানেরা অবসর বিনোদনের জন্য তর্কবিতর্কের আসর চালু করলেন। সেখানে ভিন্ন ভিন্ন মাহজাবের পণ্ডিতরা এসে একে অপরকে বিতর্কে পরাজিত করতেন। তারা ভুলেই গেলেন যে, দীনের কোনো বিষয় নিয়ে মতভেদ তৈরি করা, তর্কাতর্কি করা কুফর, যা ইসলামের সর্বোচ্চ পাপ। আসর বসিয়ে সেই বাহাসের প্রচলন আমাদের সমাজে এখনও প্রচলিত আছে। সেই বাহাসের বিষয়গুলো কী? কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি:

১. জানাজা বা পাঞ্জেগানা নামাজের পর মোনাজাত করা যাবে কি যাবে না?
২. নবীজি মাটির তৈরি নাকি নূরের তৈরি?
৩. আল্লাহর আকার আছে নাকি নেই?
৪. মিলাদে দরুদ কি দাঁড়িয়ে হবে নাকি বসে হবে?
৫. আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান নাকি আরশে সমাসীন?
৬. রাফুল ইয়াদাইন হবে কি হবে না?
৭. বেতেরের নামাজ ৩ রাকাত নাকি ১ রাকাত?
৮. তারাবি ৮ রাকাত নাকি ২০ রাকাত?
৯. এমাম সুরা ফাতিহা পড়ার পর মুক্তাদিরা আমিন জোরে নাকি আস্তে বলবেন?
১০. ঈদের নামাজে ও জানাজার নামাজে কয় তাকবির হবে?
১১. এমামের পেছনে মুক্তাদিরা কি মনে মনে সুরা ফাতিহা পড়বেন নাকি পড়বেন না?
১২. নামাজে হাত কোথায় বাঁধা হবে, বুকে নাকি নাভির নিচে?

এমন আরো অগণিত সামান্য বিষয় নিয়ে এ জাতির আলেমগণ বিতর্কে লিপ্ত যা তাদেরকেসহ গোটা জাতিকে টুকরো টুকরো করে রেখেছে। অথচ আল্লাহ বলেন, আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। ... আর তাদের মত হয়ো না, যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং

নিদর্শন সমূহ আসার পরও বিরোধিতা করতে শুরু করেছে-তাদের জন্যে রয়েছে ভয়ঙ্কর আযাব। [সুরা ইমরান ১০৩ - ১০৫]

তওহীদের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ থাকার এমন শত শত কোর'আন ও রসুলাল্লাহর বাণী তাদের পথ দেখাতে পারল না। তারা মনের আনন্দে জাতিটাকে যত দলে ভাগ করার সম্ভব করলেন আর ভাবতে লাগলেন দীনের মহা উপকার করছি। যারা তাদের ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করেছে এবং অনেক দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উল্লসিত। (সুরা রূম ৩২)

এই সবই হলো দীনের ফিকাহ ও মাসলা-মাসায়েল নিয়ে অতি বিশ্লেষণের ফলে। দীন নিয়ে এই বাড়াবাড়ির ফলে দীন এতটাই জটিল ও দুর্বোধ্য হয়ে দাঁড়ালো যে সেটা আর আল্লাহর পাঠানো সহজ-সরল সিরাতুল মুস্তাকিম ইসলাম রইল না। জাতির ঐক্য চূর্ণ-বিচূর্ণ করে তারা পণ্ডিত হলেন, ইমাম হলেন। তারা জাতিকে অতি পরহেজগার মুসলিম বানাতে গিয়ে মো'মেনের সংজ্ঞা থেকেই বের করে দিলেন। তারা ভুলে গেল মো'মেনের সংজ্ঞায় আল্লাহ বলেছেন, মোমেন শুধু তারা, যারা আল্লাহ ও রসুলের প্রতি ঈমান আনে, কোনো সন্দেহ পোষণ করে না এবং সম্পদ ও জীবন কোরবান করে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ (সর্বাত্মক সংগ্রাম) করে (সুরা হুজুরাত ১৫)। এজন্যই আল্লাহ ও তাঁর রসুল বারবার বলেছেন তোমরা দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না। দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি করে পূর্বের অনেক উম্মাহ ধ্বংস হয়ে গেছে। (সুরা নিসা ১৭১, সুরা মায়েদা ৭৭ ও বহু হাদিস)

• সুফিবাদি তরিকার বিভাজন

মহান আল্লাহ আখেরী নবী মোহাম্মদ (সা.) এর উপরে শেষ জীবনবিধান (দীন) হিসেবে যে জীবনব্যবস্থাটি পাঠিয়েছেন সেটা ভারসাম্যযুক্ত জীবনব্যবস্থা। কিসের ভারসাম্য? দুনিয়া ও আখেরাতের ভারসাম্য, দেহ ও আত্মার, শরীয়াত এবং মারেফতের ভারসাম্য। এজন্য আল্লাহ এই উম্মাহকে বলেছেন, "আমি তোমাদেরকে ভারসাম্যযুক্ত জাতি হিসেবে সৃষ্টি করেছি" (উম্মাতে ওয়াসাতা-সুরা বাকারা ১৪৩)।

যুগে যুগে যত নবী-রসুলদেরকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন প্রত্যেক নবীর উম্মাহ পরবর্তীতে দীনের ভারসাম্য নষ্ট করেছে। এই ভারসাম্যকে ফিরিয়ে আনার জন্য আল্লাহ আবার নবী পাঠিয়েছেন। শরিয়ত হল ইসলামের কর্মমূখী/আচরণবাদী দিক। আর মারেফাত হল ইসলামের মর্মমুখী বা মরমি দিক। কোনো জাতি শরীয়াহর উপর বেশি গুরুত্ব দিলে, আধিক্য

তওহীদ হচ্ছে এই ঘোষণা দেওয়া যে আমরা আমাদের জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে একমাত্র আল্লাহর হুকুম মেনে চলব; যে বিষয়ে আল্লাহর হুকুম আছে সে বিষয়ে আর কারো হুকুম মানব না। বর্তমানে পৃথিবীর এক ইঞ্চি মাটিতেও এই তওহীদ অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত নেই।

জালের ন্যায় সাধারণ মানুষের বোধগম্যতার বাইরে নিয়ে গেল। তাদের এই ব্যাখ্যা, অতি ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, তাফসির, ফেকাহর, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের উপর গড়ে উঠল বিভিন্ন মত, পথ, ফেরকা, মাজহাব ইত্যাদি।

ওদিকে পারস্য থেকে পূর্ববর্তী যরোথুস্ট্রিয়ান ধর্মের বিকৃত আধ্যাত্মিকতা এই জাতির মধ্যে বিস্তার লাভ করল। এর প্রভাবে জাতির একটি বড় অংশ আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম ত্যাগ করে অন্তর্মুখী হয়ে গেল, সেখানে আধ্যাত্মিক সাধনা করে রিপুজয়ী, সাধু-সন্ন্যাসী হওয়ার চেষ্টা করল। একদল দীনের সহজ-সরলতাকে জটিল দুর্বোধ্য করে জাতিকে খণ্ড-বিখণ্ড করে দিল। আরেক দল দীনের বহির্মুখী, সংগ্রামী, জেহাদী চরিত্রকে অন্তর্মুখী, ঘরমুখী করে ফেলল। দুই দলই দীনের ভারসাম্য নষ্ট করে ফেলল। শেষ ইসলামের একটি বুনিয়াদী নীতি হলো, এখানে মতভেদ করে ঐক্য নষ্ট করার এবং অন্তর্মুখীতার কোনো সুযোগ নেই। মোহাম্মদ (সা.) এর জাতিটি প্রচণ্ড গতিশীল (উুহধসরপ), বহির্মুখী, সংঘাতমুখী (Battle Oriented)। কাজেই যাদের কথা ও কাজ এই মহাজাতিকে খণ্ড-বিখণ্ড করে, ঘরমুখী, নির্জীব, প্রাণহীন, নিঃসাড়, জেহাদবিমুখ করে তারা এই দীনের এবং আল্লাহ ও রসুলের শত্রু। তারা যত বড় আলেম, ফকীহ, দরবেশ, মোফাসসেরই হোন না কেন, তারা উম্মতে মোহাম্মদীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

এই দীনে মানুষের আত্মার উন্নতির যে অংশটুকু আছে তাকে যদি মা'রেফাত বলে ধরে নেওয়া যায় তবে

এ দীন হলো শরিয়াহ ও মা'রেফাতের মিশ্রণে একটি পূর্ণ ব্যবস্থা। মানুষ এক পায়ে হাঁটতে পারে না, তাকে দু'পায়ে ভারসাম্য করতে হয়। দীনেরও দু'টি পা। এক পা শরিয়াহ অন্য পা মারেফাত। এই দুই পায়ের সহযোগিতায় একটা মানুষ ভারসাম্য রেখে হাঁটতে পারে। একটা জাতির বেলায়ও তাই। ঐ দুই পায়ের একটা বাদ দিলে বা নিষ্ক্রিয় হয়ে গেলে ঐ জাতিও আর হাঁটতে পারবে না, তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যেও পৌঁছতে পারবে না। সুফি-সাধকরা এই দীনের মারেফাতের পা'টাকে আঁকড়ে ধরলেন। অবশ্য শরিয়াহর পায়ের যেটুকু ব্যক্তিগত পর্যায়ের সেটুকু আংশিকভাবে গ্রহণ করলেন। কিন্তু এ দীনের শরিয়াহ প্রধানতই জাতীয়; রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা ও দণ্ডবিধিই এর প্রধান ভাগ। এই প্রধান অংশটুকুকে বাদ দিয়ে শুধু ব্যক্তিগত শরিয়াহ ও আত্মার উন্নতির অংশটুকু গ্রহণ করে নির্জনবাসী হয়ে সুফিরা এই দীনের একটা পা কেটে ফেললেন। ফলে এ দীন স্থবির হয়ে গেল, চলার শক্তি হারিয়ে ফেলল। যে জিনিসের গতি নেই সেটা মৃত, গতিই প্রাণ। এক পা হারিয়ে এই জাতি চলার শক্তি হারাল, তারপর ভারসাম্য হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। যে জাতি শরিয়াহ আর মারেফাতের দু'পায়ে হেঁটে আরব থেকে বের হয়ে আটলান্টিকের তীর আর চীনের সীমান্ত পর্যন্ত গেল, সে জাতি ফকিহ, মোফাসসের আর সুফিদের কাজের ফলে চলার শক্তি হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। একদল জাতিকে খণ্ড বিখণ্ড করল, অন্যদল জাতির বহির্মুখী গতিকে উল্টিয়ে অন্তর্মুখী বা ঘরমুখী করে দিল। আজও এই জাতি শত শত আধ্যাত্মিক তরিকায় বিভক্ত হয়ে আছে।

- **গজব ও পতন**

অনৈক্যে পতন। একদিকে শরিয়ত-মারেফত নিয়ে জাতি হাজার হাজার দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে দুর্বল হয়ে গেল। অপরদিকে জেহাদ (সংগ্রাম) ছেড়ে দেওয়ার দরুন উম্মতে মোহাম্মদির দুর্বার সংগ্রামী চরিত্র হারিয়ে ফেলল। ফলে যখন ইউরোপীয় খ্রিষ্টান, মঙ্গোল, তাতার জাতি-উপজাতিগুলো তাদেরকে আক্রমণ করল, মুসলিম জাতি সেটার বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য কোনো প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারল না। বিরাট খাওয়ারিজমি সালতানাত, বাগদাদকেন্দ্রিক আব্বাস খেলাফত, স্পেন ও মিশরের ফাতেমি খেলাফত তাসের ঘরের মতো ধসে পড়ল। এই পতনের সময়ে কেবল সুলতান সালাহদিন জাতিকে কিছুদিনের জন্য ঐক্যসূত্রে বাঁধতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে মুসলিমরা সাময়িক জয়লাভ করলেও শেষরক্ষা হয় নি। প্রায় পুরো মুসলিম বিশ্বই ইউরোপীয় নানা জাতির উপনিবেশে পরিণত হয়। এই উপনিবেশ স্থাপন করতে গিয়ে তারা অগণিত মুসলিমকে হত্যা করে, নারীদেরকে ধর্ষণ করে, জাহাজে করে ইউরোপের বেশ্যালয়ে বিক্রি করে দেয়। এটা ছিল মুসলিম জাতির উপর আল্লাহর গজব, আর এই গজব এখনও চলমান আছে।

মুসলিম অধ্যুষিত ভূখণ্ডগুলো যখন ইউরোপীয়রা দখল করে নেয় তখন নিজেদের মধ্যকার অনৈক্যের দরুন মুসলিম জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে নি। আর ইউরোপীয় শাসনামলে তারা যেন কোনোভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে শক্তিশালী হতে না পারে সেজন্য শাসকগোষ্ঠী আলিয়া মাদ্রাসার মতো মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করে। সেখানে যেসব বিষয়ে ফকিহ, মুফতি ও ইমামগণের মধ্যে পূর্ব থেকে শরিয়াহ নিয়ে যে বিষয়গুলোতে তুমুল মতভেদ চলে আসছিল সেই বিষয়গুলোকেই শিক্ষা দেওয়া হল, যাতে করে এই বিভক্তি দৃঢ়মূল হয়ে চিরস্থায়ী রূপ লাভ করে। অনৈক্য ও বিভক্তিকে একেবারে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান করল ব্রিটিশ তথা ইউরোপীয় শাসকরা। আমরা এখনও সেই মাসলা-মাসায়েল নিয়ে ফেরকা-মাজহাবের গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খেয়েই চলেছি। এই প্রবন্ধে অনৈক্যের কারণগুলো চিহ্নিত করে দেওয়া হল। এই কারণগুলো যত তাড়াতাড়ি আমাদের মন-মগজ থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারব, তত তাড়াতাড়ি আমরা আবারও আল্লাহর মনোনীত একজন এমামের নেতৃত্বে ইস্পাতকঠিন ঐক্যবদ্ধ, সুশৃঙ্খল, আল্লাহর হুকুমের প্রতি আনুগত্যশীল, সত্য প্রতিষ্ঠায় জীবন বিলিয়ে দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ জাতিতে পরিণত হতে পারব ইনশাল্লাহ।

[লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট;
ইমেইল: opinion.hezbuttawheed@gmail.com,
ফোন: ০১৬৭০১৭৪৬৪৩, ০১৬৭০১৭৪৬৫১, ০১৭১১৫৭১৫৮১]

বহুমুখী শিক্ষাব্যবস্থায় বিভ্রান্ত জাতি

রিয়াদুল হাসান

এক বাবার তিন ছেলে। একজনকে দিয়েছেন সাধারণ সরকারি স্কুলে, একজনকে দিয়েছেন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে। বংশে একজন আলেম থাকা দরকার তাই ছোট ছেলেকে দিয়েছেন মাদ্রাসায়। দেখা গেল পড়াশুনা শেষে তিন ছেলে হয়ে গেছে তিন রকম। তাদের স্বভাব চরিত্র তিনরকম, ভাষা তিন রকম, রুচি-অভিরুচি তিন রকম, জীবনের লক্ষ্য তিন রকম, তাদের মূল্যবোধ তিনরকম, ধর্ম-দেশ-মানুষ নিয়ে তিনরকম তাদের দৃষ্টিভঙ্গি। একসঙ্গে থাকে কিন্তু তাদের মাঝখানে লক্ষ যোজন ফাঁক। যে কোনো বিষয় নিয়ে কথা উঠলে তাদের তিনজন তিনরকম মত দেয়, শেষে তর্কাতর্কিতে লিপ্ত হয়, কোনো বিষয়েই একমত হতে পারে না। বাবা-মা কোনোভাবেই তাদেরকে বোঝাতে পারেন না যে তাদের ঐক্যবদ্ধ থাকা কতটা জরুরি। তারা বুঝতে পারেন এই সমস্যার পেছনে রয়েছে তাদের শিক্ষার বৈপরীত্য।

আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকে বহুমুখী শিক্ষাব্যবস্থা বলা হয়ে থাকে। কারণ শিক্ষাজীবনের সূচনাতেই আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পৃথক পৃথক পদ্ধতির শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান শুরু করা হয়। যেমন আমাদের দেশে সাধারণ, মাদরাসা, ইংরেজিসহ নানা মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। আছে সরকার পরিচালিত সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষা। পাশাপাশি মাদরাসা শিক্ষার মধ্যে একটা হলো কওমি, আরেকটা আলিয়া। বিত্তশীলদের জন্য আছে ইংরেজি মাধ্যম। কোনো কোনো ইংরেজি মাধ্যম আবার বিদেশি শিক্ষাক্রম অনুসরণ করে; যেমন অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে পৃথক পৃথক কারিকুলাম বা শিক্ষাক্রম। আবার বাংলাদেশের ইংলিশ ভার্সনও চালু আছে।

এভাবে বহুমুখী শিক্ষার দ্বারা জাতির মধ্যে বিভাজন তৈরি হচ্ছে যার সুদূরপ্রসারী কুফল ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। কিছুদিন পর পর ধর্মীয় ইস্যুতে বাঁধে ভয়াবহ দাঙ্গা। হিন্দু পল্লীতে জ্বলে আগুন, কখনও কোর'আন অবমাননার অজুহাতে পিটিয়ে মানুষ মারা হয়। অধিকাংশ মানুষ থাকে দর্শকের ভূমিকায়। কেউ করে ধর্মীয় রাজনীতি, কেউ করে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি। আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্ররা যে ধর্মীয় রাজনীতি করেন, কওমী ছাত্ররা সেটা করেন না। তাদের নীতি আলাদা। তাদের ওয়াজ আলাদা, খোতবা আলাদা, আন্দোলন আলাদা। কোনো সংকট, কোনো জাতীয় উদ্যোগ, কোনো সামষ্টিক স্বার্থেও তারা এক হতে পারেন না। টালমাটাল বিশ্বপরিস্থিতিতে এই অনৈক্য জাতির অস্তিত্বের জন্য অশনিসংকেত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বহুমুখী শিক্ষাব্যবস্থার কুফলগুলো নিয়ে বহুদিন থেকেই শিক্ষাগবেষকগণ কথা বলে আসছেন। ২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে একমুখী শিক্ষার ওপর গুরুত্বও দেওয়া হয়েছিল। তাতে স্পষ্ট বলা আছে, মৌলিক শিক্ষা হবে একমুখী, সবার জন্য বাধ্যতামূলক। স্বভাবতই মৌলিক শিক্ষার পর কিছুটা বিভাজন হতে পারে। কিন্তু সেই শিক্ষানীতি এখনও বাস্তবায়িত হয়নি।

ছোটবেলায় আমাদের একটি কথা শেখানো হয়, 'লেখাপড়া করে যে, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে'। অর্থাৎ শুধু অর্থের জন্যেই লেখাপড়া করা এই মন্ত্রটি আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে জন্মের পর থেকেই ঢোকানো হয়েছে। এই বোধ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমাদের পিছু ছাড়ে

না। তাই সারাজীবনই আমাদের মূলমন্ত্র হলো- 'চাই চাই আরও চাই'। এই বস্তুকেন্দ্রিক সুখের অন্বেষণ, উন্নত জীবনমানের পেছনে ছোটার শিক্ষা এটা পশ্চিমা বস্তুবাদী সভ্যতার অনুকরণের ফল। অনেকেই হয়ত অবগত নন যে, বর্তমানে প্রচলিত বহুমুখী শিক্ষার গোড়ায় ছিল ব্রিটিশ শাসনবুদ্ধি ও প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা, তাদের রোপিত ডিভাইড এন্ড রুল নীতির বিষবৃক্ষই দশদিকে এত ডালপালা বিস্তার করেছে।

ব্রিটিশ আমলের আগে মুসলিম শাসকদের তৈরি ব্যবস্থা অনুযায়ী এই দেশের সরকারি কার্যক্রম পরিচালিত হত। সেই ব্যবস্থাগুলো ব্রিটিশ শাসকরা ধীরে ধীরে নিজেদের সুবিধামত বদলে নেয়। ব্রিটিশ ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়ারেন হেস্টিং অক্টোবর ১৭৮০ সালে রাজধানী কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেন ক্যালকাটা মাদ্রাসা, যার বর্তমান নাম আলিয়া মাদ্রাসা। আলিয়া মাদ্রাসায় পর পর ২৬ জন অধ্যক্ষ ছিলেন ইংরেজ খ্রিষ্টান যারা প্রত্যেকেই ছিলেন প্রাচ্যবিদ। এ মাদ্রাসার প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন ড . এ . স্প্রেঙ্গার (১৮৫০-৫৭)। সর্বশেষ ইংরেজ অধ্যক্ষ ছিলেন আলেকজান্ডার হেমিলটন হার্লি (১৯১১-২৩ এবং ১৯২৫-২৭) । ১৮৫০ সালে প্রথম অধ্যক্ষ নিয়োগের পূর্বে (১৭৮০-১৮৫০) আলিয়া মাদ্রাসার প্রধান নির্বাহীর পদবী ছিল সেক্রেটারী। ক্যাপটেন আয়রন (ঈধঢ়ঃ . ওৎড়হ) ছিলেন প্রথম সেক্রেটারী। আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ১৪৬ বছর পর ১৯২৭ সনে যখন ইংরেজরা এটা বুঝতে পেরেছে তাদের তৈরি বিকৃত ইসলামটা তাদের তৈরি মাদ্রাসায় পড়া মুসলমানদের মনে-মগজে গেড়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে, তখন তাদেরই ছাত্র শামসুল উলামা কামালুদ্দিন আহমদকে (আই.ই.এস.) প্রথম মুসলিম অধ্যক্ষ (১৯২৭-২৮) হিসাবে নিয়োগ করা হয়। ইংরেজদের স্বার্থে ইসলামের প্রকৃত চেতনাকে কবর দেওয়ার লক্ষ্যে এ দেশে এ ধরনের শিক্ষা চালু করা হয়। (সূত্রঃ মাদ্রাসা শিক্ষাঃ এ জেড এম শামসুল আলম)

মুসলিম শাসনের সোনালি যুগে মাদ্রাসাগুলোতে জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিক্ষা-সংস্কৃতি, স্থাপত্য, রাষ্ট্রনীতি, বৈদেশিক বাণিজ্য, পররাষ্ট্রীয় বিষয়, অর্থনীতি, সমর বিজ্ঞান ইত্যাদি সকল বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হতো। মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে মুসলিম জাতি বিশ্বে ছিল অপরাজেয়। সেকালে বৈষয়িক ও নৈতিক শিক্ষার সমন্বয়ে মসজিদকেন্দ্রিক মাদ্রাসাগুলো ছিল শিক্ষার মূল ভিত্তি। আল-আজহার মসজিদে প্রথম দিকে মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষাদান পদ্ধতি শুরু হয় এবং পরবর্তীতে তা আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়, যেখানে মুসলিম শিক্ষার্থিদের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশ থেকে আগত অমুসলিম শিক্ষার্থিরাও বিদ্যা অর্জন করতেন। বর্তমানে মুসলিম বিশ্বে অগণিত মাদ্রাসা আছে, কিন্তু নানা কারণে মাদ্রাসা শিক্ষা শুধু আরবি ভাষা ও বিভিন্ন মাজহাবের মাসলা-মাসায়েলের শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এর ফলে মুসলিমগণ হারিয়েছে অর্থনৈতিক শক্তি, সামরিক শক্তি ও রাজনৈতিক ক্ষমতা। আর মাদ্রাসাগুলো থেকে যারা বেরিয়ে আসছেন তারা জীবিকার মাধ্যম হিসাবে নামাজ পড়ানো, কোর'আন খতম করা, মিলাদ পড়ানো, ওয়াজ করা ইত্যাদি করতে বাধ্য হচ্ছেন। অথচ ধর্মীয় কাজ করে, মানুষকে ইসলাম শিক্ষা দিয়ে পার্থিব স্বার্থ গ্রহণকে আল্লাহ হারাম করেছেন।

আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ৮৬ বছর পর ১৮৬৬ সনে ভারতের তদানীন্তন যুক্তপ্রদেশের দেওবন্দে প্রতিষ্ঠিত হয় দারুল উলুম দেওবন্দ। এর প্রভাবে মায়ানমার, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত ও আফগানিস্তানে দেওবন্দ মাদ্রাসার অনুরূপ বহু কওমি মাদ্রাসা গ্রড়ে ওঠে। এই মাদ্রাসাগুলো জনগণ তথা কওমের অর্থে পরিচালিত হয় বলে কওমি বলে পরিচিত হয়। এই মাদ্রাসার সিলেবাস ও কারিকুলাম আলিয়া থেকে পৃথক। কওমি মাদ্রাসার আলেমগণ ইংরেজি চর্চাকে হারাম মনে করতেন। এই মাদ্রাসাগুলোতে ছাত্রদের মধ্যে তাদের নিজ নিজ এলাকায় মাদ্রাসা স্থাপনের প্রবণতা সৃষ্টি করে দেওয়া হয়। এজন্য তাদেরকে নতুন মাদ্রাসা স্থাপনের ফজিলত শিক্ষাদানের পাশাপাশি মাদ্রাসা পরিচালনা পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

আলিয়া বা কওমি মাদ্রাসায় অনুসৃত সিলেবাস পাঠ করে কারও পক্ষে তাজমহলের স্থপতি ঈসা আফেন্দি, চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ইবনে সিনা, আল-রাজী, বৈজ্ঞানিক ফারাবি, সমাজবিজ্ঞানী ইবনে খালদুন, পরিব্রাজক ইবনে বতুতা, আল বিরুনি, ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক, দার্শনিক আল কিন্দি, ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, কবি ফেরদৌসী, হাফিজ প্রমুখের মতো হওয়া সম্ভব নয় যারা তাদের যুগে জাগতিক সাফল্যের মাপকাঠিতে শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসাবে বিবেচিত ছিলেন।

ব্রিটিশরা মাদ্রাসা শিক্ষার পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল মূলত কেরানি সৃষ্টি করার জন্য। কারণ সরকারি প্রশাসনিক দপ্তরগুলোতে সাধারণ কাজগুলো করার জন্য এত জনশক্তি ইউরোপ থেকে নিয়ে আসা সম্ভব ছিল না। যারা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হল তারা অস্থি-মজ্জায় ব্রিটিশ সভ্যতা ও সংস্কৃতির

অনুসারীতে পরিণত হল। ইংরেজি শিক্ষার অহঙ্কারে তারা নিজেদেরকে মানুষের চেয়ে উচ্চস্তরের প্রাণী বলে ভাবতে লাগলেন। ব্রিটিশরা ভারতে তাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর অনুকরণে কিছু রাজনৈতিক দল তৈরি করে সাধারণ শিক্ষিত শ্রেণির হাতে সেগুলোর দায়িত্ব তুলে দিল। সেই পদ্ধতির রাজনীতি আজও আমাদের দেশে মহাসমারোহে চলছে। রাজনীতি করতে গিয়ে জাতি আরো বহু দলে বিভক্ত হয়েছে।

এই আত্মাহীন নৈতিকতাহীন বস্তুবাদী শিক্ষাব্যবস্থা মানুষকে মানবেতর পশুতে পরিণত করছে। এই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আমলারা হচ্ছে দুর্নীতিবাজ। তারা দেশের কোটি কোটি টাকা বিদেশে পাচার করছে। তাদের সন্তানদেরকে এদেশের স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে না পড়িয়ে পড়াচ্ছে বিদেশে। তারা সেখানে তাদের ফ্ল্যাট কিনছে, বাড়ি করছে। এ শিক্ষায় শিক্ষিত রাজনীতিকরা ব্যক্তিস্বার্থে দেশ বিক্রি করে দিচ্ছে। তারা কলমের খোঁচায় যেভাবে দেশের ক্ষতিসাধন করছে অশিক্ষিত মানুষেরা এই ক্ষতি করতে পারবে না।

এই দুটো প্রধান ভাগের পাশাপাশি তৃতীয় আরেকটি শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের দেশে চালু আছে। সেটা হচ্ছে ইংরেজি মিডিয়াম। বিদেশী কারিকুলামে ইংলিশ মিডিয়াম শিক্ষার পুরোটাই বাণিজ্যিক। ইংলিশ মিডিয়ামের স্কুলগুলোতে দেখা যায় প্রায় ৯০ ভাগ ছেলেমেয়ে স্কুলে আসে দামি গাড়িতে চড়ে, পরনে কেতাদুরস্ত পোষাক, চলনে সাহেবী ভাব। এদের বেশীরভাগই দেখা যায় বিজনেসম্যানের ছেলেমেয়ে বা এমপি/মন্ত্রীদের ছেলেমেয়ে বাদবাকি ডক্টর, ইঞ্জিনিয়ার বা অন্যান্য পেশাজীবীদের ছেলেমেয়ে, এককথায় সমাজের অনেক উঁচু স্তর থেকেই এরা আসে। তাদের স্বপ্ন ছেলেমেয়েকে চলনে, বলনে, মননে পুরোদস্তুর ইংরেজ বানিয়ে ফেলা। পড়াশুনা শেষ করে এদের অধিকাংশই স্কলারশিপ নিয়ে বিদেশ যায়। নিজের জীবন ও মেধাকে বিক্রি করে দেয় ডলারের বিনিময়ে। বাংলাদেশের 'দুর্গন্ধযুক্ত' পরিবেশে এরা আর মিশতে পারে না।

জাতির মধ্যে এই যে বিভাজন, এটি আমাদেরকে জাতি হিসাবে দুর্বল শক্তিহীন করে রেখেছে। ব্রিটিশ যুগে আমাদের প্রভু ছিল কেবল ব্রিটিশরা। আজ আমাদের বহু প্রভু। একদিকে চীন, একদিকে ভারত, একদিকে যুক্তরাষ্ট্র, একদিকে রাশিয়া। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ দরজায় কড়া নাড়ছে। এমন একটি অস্থির সময়ে আমাদের প্রয়োজন জাতীয় ঐক্য। শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে যে অনৈক্য আমাদের মাঝে সৃষ্টি করা হয়েছে সেটা থেকে মুক্ত হতে আমাদেরকে এই সর্বনাশা শিক্ষাব্যবস্থার কুফল সম্পর্কে জানতে হবে, কথা বলতে হবে। আমাদেরকে অচিরেই এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করতে হবে যা এই জাতিকে এক সূত্রে বেঁধে রাখবে। ধর্ম ও বিজ্ঞানকে একে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড় করাবে না। মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক না বানিয়ে মানবতাবাদী করবে, ধর্মান্ধ বা ধর্মবিদ্বেষী না বানিয়ে প্রগতিবাদী করবে।

[লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট, যোগাযোগ: ০১৬৭০১৭৪৬৫১, ০১৭১১০০৫০২৫, ০১৭১১৫৭১৫৮১]

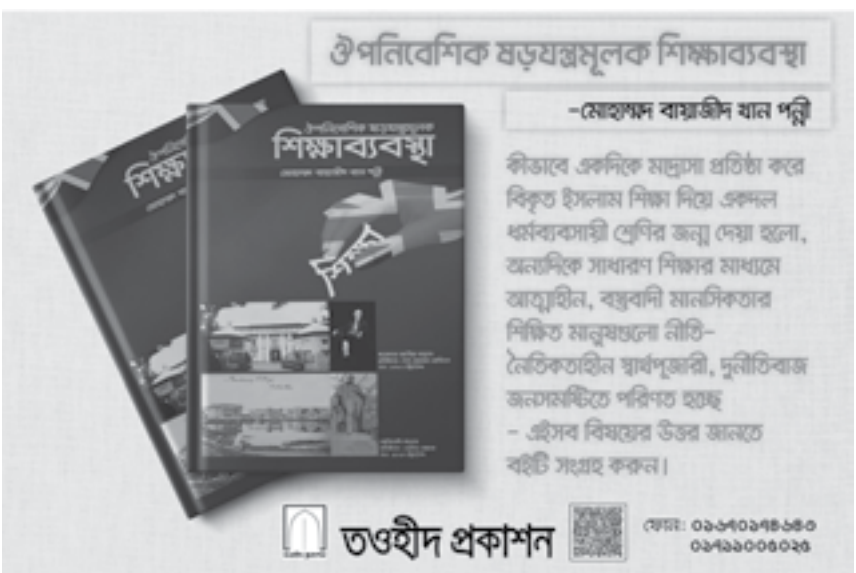

দীন প্রতিষ্ঠায় নারীদের ভূমিকা কী হবে?

জিনাত ফেরদাউস

আমরা যারা নিজেদেরকে মো'মেন, মুসলিম, উম্মতে মোহাম্মদী বলে মনে করি, আমাদের মাথায় হাজারও প্রশ্ন ঘুরপাক খায়। আমরা আমাদের ধর্মীয় নেতাদের কাছে কত কিছুই না জিজ্ঞেস করি। রোজা রেখে দাঁত ব্রাশ করা যাবে কিনা না, রোজা রেখে চুল কাটা যাবে কিনা, হাতের নখ ও মাথার চুল কাটলে রোজা ভাঙবে কিনা ইত্যাদি খুঁটিনাটি কতকিছু। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো- একবারও আমাদের মাথায় এই প্রশ্নটা আসে না যে, 'দুনিয়াতে আমাদের কাজ কী, দায়িত্ব কী, আমাদের জীবনের মিশন কী? কেন আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন? কেন আল্লাহ উম্মতে মোহাম্মদী হিসেবে আমাদের উত্থান ঘটিয়েছেন?' অর্থাৎ সবার আগে যে প্রশ্নটা আমাদের মাথায় আসা উচিত ছিল, সেই প্রশ্নটা কেন জানি কখনই মাথায় আসে না। মো'মেন জীবনের উদ্দেশ্য না বুঝেই, উম্মতে মোহাম্মদীর দায়িত্ব ও কর্তব্য না বুঝেই দিব্যি আমরা জীবন কাটিয়ে দিচ্ছি, আর ভাবছি আল্লাহ বোধহয় আমাদের জন্য জান্নাতের দরজায় লাল গালিচা বিছিয়ে অপেক্ষা করছেন। মৃত্যু হতে দেরি, জান্নাতে যেতে দেরি হবে না!

পাঠক, আমরা প্রশ্ন না করলে কী হবে, আল্লাহ কিন্তু উত্তর দিয়ে রেখেছেন ১৪০০ বছর আগেই। পবিত্র কোর'আনের সুরা ইমরানের ১১০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন, "তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, মানবজাতির মধ্য থেকে তোমাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে তোমরা সৎ কাজের আদেশ দিবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে।" কত স্পষ্টভাবে মহান রব্বুল আলামিন আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য স্থির করে দিলেন! সেইসঙ্গে এটাও বলে দিলেন- এই দায়িত্ব পালন করার জন্যই আমরা হব শ্রেষ্ঠ জাতি। যদি কোনোদিন এই দায়িত্ব কর্তব্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিই, মানুষকে আর সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ না করি, তাহলে শ্রেষ্ঠ জাতি দাবি করার সার্থকতা আর থাকবে না।

এই আয়াত শোনার পর একজন নারী হিসেবে আমার মাথায় বাড়তি যে প্রশ্নটা আসে তাহলো- আল্লাহ সৎ কাজের নির্দেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের যে দায়িত্ব এই জাতিকে দিলেন, তা কি শুধু পুরুষদের জন্যই? আমরা যারা নারী, আমাদের কি এই দায়িত্ব পালন করতে হবে না?

• দায়িত্ব কি পুরুষের একার?

অনেকেই বলবেন- দায়িত্বটা পুরুষের একার, নারীদের জন্য নয়। কেন নারীদের জন্য নয়? কারণ নারীর বিচরণের জায়গা হলো বাড়ির অন্দরমহল! অন্দরমহলে বসে তো পুরো মানবজতিকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা যায় না। এর জন্য ছুটে বেড়াতে হবে রাস্তাঘাটে, অফিস-আদালতে, দশ-দিগন্তে, পাড়ি দিতে হবে সাত সমুদ্র তেরো নদী। এসব কি নারীদের দ্বারা সম্ভব? নারী হলো ঘরের শোভা। ঝিনুকে লুকোনো মুক্তার মতো সে থাকবে ঘরের চার দেয়ালের ভেতরে সুরক্ষিত। ঘরের শোভা বর্ধনের পাশাপাশি সে নামাজ-কালাম, জিকির আজকার করবে ও স্বামী-সংসারের যত্ন নেবে। এই হলো নারীজীবনের উদ্দেশ্য!

নারীদের সম্পর্কে এমন ধারণা যে মুসলিম সমাজে জন্ম নিবে, তা মহান রব্বুল আলামিন ভালোভাবেই জানতেন। এও জানতেন পবিত্র কোর'আনে মো'মেনদের দায়িত্ব-কর্তব্য স্থির করে দেওয়ার পরও সেটা নিয়ে বিতর্ক দেখা দিবে, নারীদের অধিকারকে করা হবে সংকুচিত। তাই তওবার ৭১ নম্বর আয়াতে সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন- "মো'মেন নারী ও মো'মেন পুরুষ একে অপরের বন্ধু ও সহযোগী।

তারা সৎ কাজের আদেশ দেয় ও অসৎ কাজে নিষেধ করে।" আয়াতটির কথা হুবহু ইমরানের ১১০ নম্বর আয়াতের মতোই, শুধু আরেকটি বিষয় এখানে বাড়তি যুক্ত করে আল্লাহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন পুরুষের একার নয়, নারীদেরও দায়িত্ব মানবজাতিকে সৎ কাজে আদেশ করা ও অসৎ কাজে নিষেধ করা!

এই আয়াতের পর আর বলার সুযোগ নেই নারীদের কাজ শুধু ঘরেই সীমাবদ্ধ, পুরুষের কাজ বাহিরে। না, বরং আল্লাহর অভিপ্রায় হলো- মো'মেন নারী ও মো'মেন পুরুষ একে অপরের বন্ধু হিসেবে মানবজাতিকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার দায়িত্ব পালন করবে একইসঙ্গে, একইপথে।

• আদেশ করার অধিকার আছে তো?

পাঠক, আপনি নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন উপরোক্ত আয়াত দু'টিতে আল্লাহ শব্দ ব্যবহার করেছেন "আমর" অর্থাৎ আদেশ। আল্লাহ কিন্তু বলেননি মানুষকে সৎ কাজের উপদেশ দিতে বা অনুরোধ করতে। বলেছেন সৎ কাজের আদেশ করতে। আদেশ ও অনুরোধের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো- অনুরোধ করতে যে কেউ পারে, কিন্তু আদেশ করতে হলে অবশ্যই আদেশ দেওয়ার অধিকার থাকতে হয়, শাসনকর্তৃত্ব থাকতে হয়। যে ভূখণ্ডে আপনি আল্লাহর হুকুম মোতাবেক আদেশ নিষেধ দিবেন, সেই ভূখণ্ডে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত থাকতে হয়। তার মানে দেখা যাচ্ছে, আল্লাহর এই নির্দেশ পালন করার জন্য মো'মেন-মো'মেনাদেরকে আগে দীন প্রতিষ্ঠা করতে হচ্ছে, তারপরেই তারা পাচ্ছে আদেশ নিষেধ দেওয়ার অধিকার। মূলত সেজন্যই আল্লাহ কোর'আনে দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের কথা বারবার বলেছেন। এমনকি মো'মেনের সংজ্ঞার মধ্যেই দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে শর্ত হিসেবে রেখে দিয়েছেন। (সুরা হুজরাত ১৫)

বলা বাহুল্য- এখানে কিন্তু বিতর্ক চলবে না যে, দীন প্রতিষ্ঠার কাজ নারীদের নাকি পুরুষদের? যেহেতু মানবজাতিকে সৎ কাজের আদেশ ও নিষেধের দায়িত্ব নারী-পুরুষ উভয়ের, তাই সেটার পূর্বশর্ত দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্বও নারী ও পুরুষ উভয়কেই সমানভাবে পালন করতে হবে, একথা সাধারণ জ্ঞানেই বোঝা যায়। এছাড়াও আল্লাহ যতগুলো আয়াতে দীন প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম বা জেহাদ করার আদেশ দিয়েছেন, প্রতিটি জায়গায় তিনি 'হে মো'মেনগণ' বলে সম্বোধন করেছেন। আর মো'মেনগণ বললে মো'মেন নারী ও পুরুষ উভয়কেই সাধারণভাবে বোঝানো হয়। তিনি যখন সালাত, সওম, হজ, যাকাতের নির্দেশ দিয়েছেন তখন এই প্রশ্ন ওঠে না যে এই নির্দেশ কি পুরুষের জন্য, নাকি নারীরাও এর লক্ষ্যবস্তু? সবাই বুঝে নেয় যে এ আদেশ সবার জন্য। কিন্তু দীন প্রতিষ্ঠার জেহাদের কথা উঠলেই নারীদেরকে ঘরে পাঠিয়ে দেওয়ার তোরজোড় শুরু হয়ে যায়। তথাপি আল্লাহ সুরা ইমরানের ১৯৫ নং আয়াতে স্পষ্ট করে দিলেন এই বলে যে, "আমি তোমাদের কোন পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করি না, তা সে পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রীলোক। তোমরা পরস্পর এক। তারপর সে সমস্ত লোক যারা হেজরত করেছে, তাদেরকে নিজেদের দেশ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের প্রতি উৎপীড়ন করা হয়েছে আমার পথে এবং যারা লড়াই করেছে ও মৃত্যুবরণ করেছে, অবশ্যই আমি তাদের উপর থেকে অকল্যাণকে অপসারিত করব। এবং তাদেরকে প্রবিষ্ট করব জান্নাতে যার তলদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত।" সুতরাং দীন প্রতিষ্ঠার প্রতিটি কাজেই নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণকে আল্লাহ পুরস্কৃত করবেন বলে ঘোষণা দিলেন।

• প্রশ্ন হলো, এই দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নারীরা কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারেন?

আমরা যদি রসুলাল্লাহর যুগের নারী সাহাবীদের জীবনী দেখি, তাহলে এক ঐতিহাসিক নবজাগরণের নজির দেখতে পাই। সেই যুগে দীন প্রতিষ্ঠার জন্য নারীরা কী করেছেন তা বাদ দিয়ে বরং আমাদের ভাবা উচিত- তারা কী করেননি? সোজা কথায়, পুরুষরা যা যা করেছেন নারীরাও তাই করেছেন। একবিন্দুও পিছিয়ে ছিলেন না। উপরন্তু তাদেরকে পুরুষদের চেয়েও বেশি সংগ্রাম করতে হয়েছে, কারণ সংসার ও সন্তান সামলানোর দায়িত্বও পালন করেছেন, আবার দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামও করেছেন। যে হাতে রুটি বানিয়েছেন, সেই হাতেই ধরেছেন তরবারি!

প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী নারী আম্মা খাদিজা (রা.) এর ত্যাগ ও কুরবানির পরিমাপ করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। দীন প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি নিজের সমস্ত সহায়-সম্পত্তি উজাড় করে দিয়েছিলেন। শেষজীবনে তিনি প্রচণ্ড অর্থ ও খাদ্যাভাবে ভুগেছেন, অথচ একদা তাঁর একার ব্যবসাই ছিল মক্কার সকল ব্যবসায়ীর চেয়ে বড়। নবুয়্যত লাভের আগে থেকেই ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে রসুলাল্লাহর নজর ছিল না। আর নবুয়্যত লাভের পর তো জীবনের এমন এক অধ্যায় শুরু হলো- যখন ব্যবসা বাণিজ্য করে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবার সুযোগই আর রইল না। তার মানে খুব সম্ভবত মদিনায় হিজরত পর্যন্ত দীর্ঘ সময় আম্মা খাদিজার

ব্যবসায়িক পুঁজি ভেঙেই সংসার চলেছে রসুলাল্লাহর। আর এই মহিয়সী নারী একদিনের জন্যও তাতে আপত্তি করেননি। অগ্নিঝরা দিনগুলোতে রসুলাল্লাহ চারদিক থেকে রুক্ষ ব্যবহারের মুখোমুখী হয়ে যখন ঘরে ফিরতেন, তাঁকে আত্মিকভাবে ও মানসিকভাবে প্রেরণা যোগাতেন আম্মা খাদিজা (রা.)। রসুলাল্লাহর মাথার উপর ছায়া হয়ে থাকত আম্মা খাদিজার (রা.) এক পৃথিবী ভালোবাসা ও সীমাহীন আস্থা। কখনও হতাশা স্পর্শ করতে দেননি রসুলাল্লাহর মনে। দীন প্রতিষ্ঠার জন্য আম্মা খাদিজা নিজেও দিয়েছেন চরম কোরবানি। মক্কায় যখন মো'মেনদেরকে তিন বছর অবরোধ করে রাখা হয়েছিল, তখন মো'মেনদের জন্য নিজের সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছেন, নিজে না খেয়ে অন্যদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেছেন। এরই ধকল সামাল দিতে না পেরে খাদ্য ও পুষ্টিহীনতায় ইন্তেকাল করেছিলেন আম্মা খাদিজা (রা.) এমনটাই ধারণা করেন ঐতিহাসিকরা।

ইসলামের জন্য প্রথম শহীদও হয়েছেন একজন নারী- সুমাইয়া (রা.)। চাইলেই নিজের ঈমানের কথা গোপন রাখতে পারতেন, জীবন বাঁচাতে পারতেন। কিন্তু শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তওহীদের ঘোষণা দিয়েছেন নির্ভিকচিত্তে।

তাঁদেরই অসামান্য আত্মত্যাগে তওহীদের বালাগ ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র আরবে। মদিনার বহু মানুষ তওহীদ গ্রহণ করে নিলে আল্লাহর রসুল ও তাঁর সাহাবীরা মদিনায় হিজরত করলেন। নারীরাও ঘরবাড়ির মায়া ত্যাগ করে পাড়ি জমালেন অজানা অচেনা মদিনায়। সেখানে গিয়ে গড়ে তুললেন নতুন ঠিকানা। মদিনা হয়ে উঠল দীনের প্রাণকেন্দ্র, মো'মেন নারী-পুরুষরা দিবারাত্রি খেয়ে না খেয়ে তওহীদের বালাগ পৌঁছে দিলেন মদিনার ঘরে ঘরে। ইহুদি পৌত্তলিক, আস্তিক-নাস্তিক সবার ঘরেই পৌঁছে গেল তওহীদের জাগরণী মন্ত্র। মদিনায় গড়ে উঠল মো'মেনদের নগররাষ্ট্র। একটা রাষ্ট্রের যা যা দরকার, মদিনায় ছোট পরিসরে সবকিছুই শুরু হলো। মসজিদে নববী হয়ে উঠলো রাষ্ট্রীয় কার্যালয়, যেখানে মো'মেন নারী ও পুরুষরা পাঁচ ওয়াক্ত সালাহ কায়েম ছাড়াও বিভিন্ন আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন ও রাষ্ট্রপ্রধানের দিক-নির্দেশনা লাভ করতেন। ভেতরে বাহিরে যুদ্ধের ডঙ্কা বেজে উঠত মুহূর্মুহু, যা সামাল দেওয়া শুধু পুরুষদের পক্ষে ছিল অসম্ভব। প্রায় প্রত্যেক যুদ্ধেই নারীরা অন্তর্ভুক্ত হতেন সেনাবাহিনীতে। কেউ রসদ সরবরাহ করতেন, কেউ আহতদের সেবা শশ্রুষা করতেন, আবার কেউবা সরাসরি অস্ত্রহাতে সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হতেন। নিহতদের দাফনের কাজ বা তৃষ্ণার্তদের পানি পানের কাজও নারীরা আঞ্জাম দিতেন। উহুদ যুদ্ধে রসুলাল্লাহকে লক্ষ্য করে যখন কাফের মোশরেকরা চরম আক্রমণ চালায়, উম্মে আম্মারা (রা.) যেন ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে যান রসুলাল্লাহর পাশে। রসুলাল্লাহ যেদিক দিয়েই আক্রান্ত হয়েছেন, সেদিকেই উম্মে আম্মারা ছুটে গেছেন আকাশচুম্বি সাহস নিয়ে। পরবর্তীতে রসুল (সা.) বলেছিলেন, "উহুদ যুদ্ধের দিন আমি ডানে ও বায়ে যেদিকে তাকিয়েছি সেদিকেই উম্মে আম্মারাকে (রা.) লড়াই করতে দেখেছি।" উম্মে আম্মারার এই বীরত্বের বর্ণনা দিয়ে রসুলাল্লাহ অন্যান্য নারীদেরকেও উৎসাহ ও উদ্দীপনা দিয়েছেন।

দীন প্রতিষ্ঠার জন্য যত কাজ সাহাবীরা করেছেন, তার মধ্যে সবচেয়ে বিপদসংকুল ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ কী? নিঃসন্দেহে শত্রুর সঙ্গে রণাঙ্গনে উপস্থিত হয়ে সম্মুখযুদ্ধ করা! তাই নয় কি? সেই কাজটাই যখন মো'মেন

নারীরা করতে বাদ রাখেননি এবং স্বয়ং রসুলাল্লাহ কর্তৃক প্রশংসিতও হয়েছেন, তাহলে আর কী কাজ বাকি থাকতে পারে যেটা নারীরা করেননি? ইতিহাসে পাই, নারীরা সামরিক অঙ্গন ছাড়াও সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাজেও অংশগ্রহণ করেছেন। মদিনার বাজার ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ করেছেন শেফা (রা.)। মসজিদে নববীতে প্রতিষ্ঠিত হাসপাতাল পরিচালনা করেছেন রুফায়দাহ (রা.)। তিনি বহু প্রশিক্ষণ দিয়ে বহু দক্ষ নার্স সৃষ্টি করেছেন যা নার্সিং এর ইতিহাসে অক্ষয় কীর্তি রচনা করেছে। মসজিদে নববি ঝাড়ু দেওয়া ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্বও পালন করেছেন নারীরা।

• **এই যুগে নারীদের ভূমিকা কী হবে?**

যুগ বদলেছে, কিন্তু ইসলামের নীতি বদলে যায়নি। রসুলাল্লাহর যুগে দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নারীদের সামনে যত উপায়ে অংশগ্রহণ করা সম্ভব ছিল, নারীরা তা করেছেন। এই যুগে সেই সুযোগ-সুবিধা আরও বেড়েছে। কারণ সামাজিক বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় এখনকার সমাজে বহু উপাদান ও উপকরণের আবির্ভাব ঘটেছে, যা দীন প্রতিষ্ঠায় কাজে লাগানো সম্ভব। রসুলাল্লাহর যুগে গণমাধ্যম বলতেই ছিল কবিতা। এখনকার যুগে কবিতা, নাটক, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, কলাম ছাড়াও রয়েছে টেলিভিশন, রেডিও, সংবাদপত্র। আরও রয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যাচ্ছে তথ্য, ঘটনা। কাজেই রসুলাল্লাহর যুগে তওহীদের মূলমন্ত্র প্রচারের ক্ষেত্র যতটুকু ছিল, এখন তার চেয়ে বহুগুণ বেশি সুযোগ সুবিধা আমরা পেতে পারি। আমরা নারীরা খুব সহজেই লেখা, গ্রাফিক্স, বা ভিডিও কনটেন্ট তৈরি করে তওহীদের মর্মবাণী অনলাইনে প্রচার করতে পারি। লিখে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করতে পারি এবং সেই পত্র-পত্রিকার কপি পৌঁছে দিতে পারি হাজারও মানুষের হাতে।

রসুলাল্লাহর যুগে তওহীদের বালাগ দেওয়ার একমাত্র বাস্তবসম্মত মাধ্যম ছিল সামনাসামনি আলোচনা, বক্তৃতা ইত্যাদি। এই যুগে প্রযুক্তির আশীর্বাদে অডিও, ভিডিও, ইন্টারনেটের সমন্বয়ে আমাদের হাতে তওহীদ প্রচারের বিশাল সুযোগ হাজির হয়েছে। খুব সহজেই আমরা আদর্শিক বক্তব্য রেকর্ড করে অনলাইনে প্রচার করতে পারি। ফেসবুক ইউটিউবে লাইভ করেও তওহীদ, আকিদা, ঈমান, কর্মসূচি, দীন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি নিয়ে আলাপ করতে পারি। রসুলাল্লাহর যুগে দশজন মানুষের কাছে বক্তব্য পৌঁছানো যেখানে অনেক কষ্টসাধ্য ছিল, আমাদের যুগে লাখ লাখ মানুষের কাছে আমাদের বক্তব্য পৌঁছে দিতে পারি কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে।

দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নারীদের সামনে এখন অবারিত কাজের সুযোগ। তারা চাইলে তওহীদের আন্দোলনকে লেখালেখির মাধ্যমে সমৃদ্ধ করতে পারেন। ভিডিও প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করতে পারেন। আন্দোলনের পত্র-পত্রিকায় সাংবাদিকতার মাধ্যমেও বিরাট অবদান রাখতে পারেন। এখন নারীদের উপার্জনেরও বিশাল সুযোগ তৈরি হয়েছে। নারীরা বৈধ উপার্জন করে আন্দোলনকে ফান্ড প্রদানের মাধ্যমেও দীন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারেন। বর্তমানে জনসংযোগের জন্য সভা-সমাবেশ বহুল ব্যবহৃত মাধ্যম। এই সভা-সমাবেশ আয়োজনের পরিকল্পনা থেকে আরম্ভ করে ব্যবস্থাপনা, তত্ত্বাবধান, অতিথি আমন্ত্রণ, শৃঙ্খলা, উপস্থাপনা, বক্তব্য প্রদান, র‍্যালি, মানববন্ধন ইত্যাদি সবকিছুই নারীরা নিজেদের জ্ঞান, যোগ্যতা ও দক্ষতাবলে সম্পন্ন করতে পারেন। চিকিৎসাক্ষেত্রে, শিক্ষাক্ষেত্রেও নারীদের কাজের অফুরন্ত সুযোগ রয়েছে।

এক কথায়, দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নারীরা এখন শত শত পন্থায় অবদান রাখতে পারেন। শুধু একটাই নীতি- অশ্লীলতা ও পর্দার বিধান লঙ্ঘন না করা। আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে নারীদেরকে শালীনতার যে মানদণ্ড বলে দিয়েছেন, তা মেনে চলে নারীরা দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অসামান্য অবদান রাখতে পারবেন।

আলহামদুলিল্লাহ! হেযবুত তওহীদের নারীরা ইতোমধ্যেই দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। পুরুষের চেয়ে তারা কোনো অংশে পিছিয়ে নেই। আন্দোলনের সকল প্রচারকার্যে নারীদের অংশগ্রহণ তো রয়েছেই, কিছু কিছু প্রচারকার্যে নারীরা পুরুষদের চেয়ে বহুগুণ সাফল্য দেখিয়ে চলেছেন। শুধু প্রচারকার্যই নয়, আন্দোলনের কেন্দ্রীয় বিভিন্ন বিভাগে, যেমন- অর্থ, হিসাব, বাণিজ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, গবেষণা, গণমাধ্যম, রাজনৈতিক যোগাযোগ, কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, নারী কল্যাণ, তথ্য, শৃঙ্খলা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, খেলাধুলা ইত্যাদি অঙ্গনে নারীরা অসাধারণ মেধা ও যোগ্যতার পরিচয় দিচ্ছেন। ইনশা'আল্লাহ- হেযবুত তওহীদের নারীরা রসুলাল্লাহ ও তাঁর নারী সাহাবীদের মতোই দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করবেন, যাদের ত্যাগ, কুরবানি ও সাহস পৃথিবীতে আলো ছড়াবে হাজার বছর ধরে।

[মতামতের জন্য যোগাযোগ: ০১৬৭০১৭৪৬৪৩, ০১৭১১০০৫০২৫, ০১৭১১৭৫১৫৮১ ।]

মো'মেন, মুসলিম ও উম্মতে মোহাম্মদী কাকে বলে?

এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

বর্তমান সময়ে চালু ইসলামে 'মো'মেন', 'মুসলিম' ও 'উম্মতে মোহাম্মদী' এই তিনটিকে একই অর্থবোধক শব্দ হিসাবে মনে করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। তিনটিই আলাদা, যদিও পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। ধারণা সঠিক করার জন্য এই তফাৎ বুঝে নেওয়া দরকার।

মো'মেন: মোমেন শব্দটি এসেছে ঈমান অর্থাৎ বিশ্বাস থেকে। পবিত্র কোর'আনে আল্লাহ মো'মেনের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে, "তারাই মো'মেন যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের উপর ঈমান আনে এবং আর কোন সন্দেহ পোষণ করে না এবং জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ (সুরা হুজরাত ১৫)।" আল্লাহর দেয়া প্রকৃত মো'মেনের এই সংজ্ঞাটা ঠিকভাবে বুঝতে গেলে আমাদের বুঝতে হবে "আল্লাহর ওপর ঈমান" এর অর্থ শুধু আল্লাহর অস্তিত্বে ও একত্বের ওপর ঈমান নয়, তাঁর উলুহিয়াতের ওপর, সার্বভৌমত্বের ওপর (Sovereignty) ঈমান। এই ঈমান তখনই পূর্ণাঙ্গতা পাবে যখন এই সাক্ষ্য দেওয়া হবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন আদেশদাতা, হুকুমদাতা নেই।

আল্লাহর দেয়া মো'মেনের এই সংজ্ঞার দ্বিতীয় ভাগ হলো প্রাণ ও সম্পদ দিয়ে সংগ্রাম করা। কী জন্য সংগ্রাম করা? আল্লাহর তওহীদের, সার্বভৌমত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত দীনটি যদি মানুষের জীবনে প্রতিষ্ঠা, কার্যকর না হয় তবে ওটা অর্থহীন। কাজেই আল্লাহর তওহীদভিত্তিক ঐ দীনুল হক, সত্য জীবন-ব্যবস্থাটা মানব জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টার আদেশ দিয়েছেন আল্লাহ। এই দু'টি একত্রে প্রকৃত মো'মেনের সংজ্ঞা। এই দু'টি যার বা যাদের মধ্যে আছে, আল্লাহর দেয়া সংজ্ঞা মোতাবেক সে বা তারা প্রকৃত মো'মেন। এই সংজ্ঞায় আল্লাহ বলেন নাই যে, যে সালাহ পড়বে সে মো'মেন, বা যে রোযা রাখবে সে মো'মেন, বা যে হজ্ব করবে, বা অন্য যে কোন পূণ্য, সওয়াবের কাজ করবে সে মো'মেন। এ সংজ্ঞায় শুধু আছে আল্লাহ ছাড়া আর সমস্ত রকম প্রভূত্ব, সার্বভৌমত্ব অস্বীকার ও আল্লাহর পথে সংগ্রাম। এর ঠিক বিপরীতে তিনি এ সতর্কবাণীও বলেছেন যে, এ তওহীদে যে বা যারা থাকবে না, যারা তাদের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত জীবনের যে কোন একটি ভাগে, অঙ্গনে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বা নিজেদের তৈরী আইন-কানুন, রীতি-নীতি গ্রহণ বা প্রয়োগ করবে, আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ইলাহ বা সার্বভৌম হুকুমদাতা হিসাবে মানবে তারা শেরক করবে। আর শেরক ক্ষমা না করার জন্য আল্লাহ অঙ্গীকারবদ্ধ (কোর'আন- সুরা নিসা ৪৮)।

দ্বিতীয়তঃ মুসলিম শব্দ এসেছে সালাম থেকে। যিনি বা যারা আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা, দীনকে সামগ্রিকভাবে তসলিম অর্থাৎ সসম্মানে গ্রহণ করে তা জাতীয়, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনে প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠা করেছেন, অন্যসব রকম ব্যবস্থাকে বর্জন করেছেন তিনি বা তারা মুসলিম। এখানেও একজন মুসলিম হয়েও মো'মেন নাও হতে পারেন। যেমন- কোথাও দেশসুদ্ধ সকলে মুসলিম হয়ে গেল। সেখানে একজন বা কিছুসংখ্যক মোশরেক বা নাস্তিক নানা রকম সামাজিক অসুবিধার কথা চিন্তা করে মুসলিম হয়ে গেল, অর্থাৎ আল্লাহ, রসুল ও ইসলামকে পূর্ণভাবে বিশ্বাস না করেও সমাজের অন্য সবার সাথে আল্লাহর আইন ও দীন স্বীকার ও তসলিম করে নিল। এ লোক মুসলিম, কিন্তু মো'মেন নয়। এর উদাহরণ দেওয়া যায় ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই। নবী করীমের ওফাতের আগেই সম্পূর্ণ আবর মুসলিম হয়ে গিয়েছিল এটা ইতিহাস। কিন্তু আল্লাহ নবীকে সম্বোধন করে বলেছেন-"আরবরা বলে, আমরা বিশ্বাস করেছি (ঈমান এনেছি)। বল, তোমরা বিশ্বাস করনি। বরং বল, আমরা শুধু আত্মসমর্পণ করেছি। কারণ বিশ্বাস (ঈমান) তোমাদের আত্মায় প্রবেশ করে নি।"

আল্লাহর কথা যে সত্য তা প্রমাণ হয়ে গেল রসুলাল্লাহ এর ওফাতের সঙ্গে সঙ্গেই। চারদিকে বহু লোক ইসলামকে অস্বীকার করে বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষ ইসলামকে গ্রহণ করার ফলে তারা বাধ্য হয়ে প্রকাশ্যে ইসলামকে স্বীকার করে মুসলিম হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সত্যিকার বিশ্বাস তারা করেনি, তারা মুসলিম হয়েছিল, কিন্তু মো'মেন হয় নি। আবু বকরের (রাঃ) নেতৃত্বে ঐ বিদ্রোহের বিরুদ্ধে প্রাণপণ যুদ্ধ করে সেদিন যারা ইসলামকে রক্ষা করেছিলেন, তারা ছিলেন মো'মেন। কোর'আনের বিভিন্ন স্থানে, মো'মেন ও মুসলিমদের আল্লাহ আলাদাভাবে সম্বোধন

করা ছাড়াও মো'মেন কারা তা তিনি সুরা হুজরাতের ১৫নং আয়াতে পরিষ্কার করে দিয়েছেন যা একটু আগেই উল্লেখ করেছি। আল্লাহর দেয়া মো'মেনের সংজ্ঞায় দু'টি শর্ত দেয়া হলো; একটি ঈমান, অর্থাৎ তওহীদ, অন্যটি ঐ তওহীদ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। বর্তমানে মুসলিম বলে পরিচিত জাতিটিতে এ দু'টি শর্তের একটিও নেই। আকিদার বিকৃতিতে আমরা জীবনের সমস্ত অঙ্গন থেকে তওহীদ অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে বাদ দিয়ে শুধু ব্যক্তি জীবনে সংকুচিত করে রেখেছি- যা প্রকৃতপক্ষে শের্ক। আর শান্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম তো উৎখাতই করে দিয়েছি এবং তারপরও নিজেদের মো'মেন ও মুসলিম বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করছি।

মো'মেন ও মুসলিম যে এক নয় তা হাদিস থেকেও দেখাচ্ছি। সা'দ (রা.) বলছেন- একবার আমি রসুলাল্লাহর কাছে বসা ছিলাম- যখন তিনি একদল লোককে দান করছিলেন। সেখানে এমন একজন লোক বসা ছিলেন যাকে আমি একজন উত্তম মো'মেন বলে বিশ্বাস করতাম। কিন্তু রসুলাল্লাহ তাঁকে কিছুই দিলেন না। এ দেখে আমি বললাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনি ওনাকে কিছু দিলেন না? আমার দৃঢ় বিশ্বাস উনি একজন মো'মেন। রসুলাল্লাহ বললেন, মো'মেন বলো না, মুসলিম বলো। আমি কিছু সময় চুপ থেকে আবার ঐ কথা বললাম এবং তিনিও আবার ঐ জবাবই দিলেন-মো'মেন বলো না, মুসলিম বলো। তৃতীয়বার আমি ঐ কথা বললে রসুলাল্লাহ বললেন সা'দ! আমি অপছন্দনীয় লোকদেরও দান করি এই কারণে যে আমার আশংকা হয় তারা অভাবের চাপে জাহান্নামের পথে চলে যেতে পারে (হাদিস-বোখারি)।" এখানে মহানবীর কথা থেকেই পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে মো'মেন ও মুসলিম এক নয়। ওইদিন আল্লাহর রসুল দান করছিলেন মুসলিমদেরকে, মো'মেনদেরকে নয়।

তৃতীয়তঃ উম্মতে মোহাম্মদী। আল্লাহ আদম (আ.) থেকে শুরু করে তার প্রত্যেক নবী-রসুল (আ.) কে পাঠিয়েছেন একটিমাত্র উদ্দেশ্য দিয়ে তাহলো যার যার জাতির মধ্যে আল্লাহর তওহীদ ও আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা দীন প্রতিষ্ঠা করা। শেষ নবীকে পাঠালেন সমস্ত মানবজাতির উপর এই দীন প্রতিষ্ঠা করার জন্য (কোর'আন-সুরা আল-ফাতাহ-২৮, সুরা আত-তওবা-৩৩, সুরা আস-সফ্-৯)। পূর্ববর্তী নবীদের উপর অর্পিত দায়িত্ব তাঁরা অনেকেই তাদের জীবনেই পূর্ণ করে যেতে পেরেছিলেন, কারণ তাদের দায়িত্বের পরিসীমা ছিল ছোট। কিন্তু এই শেষ জনের দায়িত্ব হলো এত বিরাট যে এক জীবনে তা পূর্ণ করে যাওয়া অসম্ভব। তাই তিনি এমন একটি জাতি সৃষ্টি করলেন পৃথিবী থেকে তাঁর চলে যাওয়ার পরও যে জাতি তার উপর আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব পূর্ণ করার জন্য তারই মত সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। এই জাতি হলো তার উম্মাহ-উম্মতে মোহাম্মদী- মোহাম্মদের জাতি। রসুলাল্লাহ যতদিন এই পৃথিবীতে রইলেন ততদিন তিনি নিজে তাদের ভবিষ্যৎ কাজের জন্য প্রশিক্ষণ দিলেন। মাত্র দশ বছরের মধ্যে আটাত্তরটি যুদ্ধ সংঘটিত করে, একটি দুর্ধর্ষ যোদ্ধা জাতি গঠন করে তিনি তাঁর প্রেরক প্রভুর কাছে চলে গেলেন। যে অপরাজেয় যোদ্ধা জাতিটি তিনি গঠন করে গেলেন সে জাতির আকিদার মধ্যে তিনি সুস্পষ্টভাবে গেঁথে দিয়ে গেলেন যে তাঁর ওপর আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব- সংগ্রামের মাধ্যমে সমস্ত পৃথিবীতে এই দীন প্রতিষ্ঠা করা, তাঁর অবর্তমানে তাঁর গঠিত এই উম্মাহর ওপর অর্পিত হয়েছে।

প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের মধ্যে প্রথম যিনি বিশ্বনবীকে প্রেরিত বলে স্বীকার করে এই দীনে প্রবেশ করলেন; অর্থাৎ আবু বকর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেই রসুলাল্লাহকে জিজ্ঞাসা করলেন- "হে আল্লাহর রসুল! এখন আমার কাজ কী? কর্তব্য কী?" আল্লাহর শেষ নবী যে উত্তর দিয়েছিলেন তা আমরা ইতিহাসে ও হাদিসে পাই। তিনি বললেন, "এখন থেকে আমার যে কাজ তোমারও সেই কাজ।" কোনো সন্দেহ নেই যে যদি প্রত্যেকটি মানুষ-যারা ঈমান এনে মহানবীর হাতে মুসলিম হয়েছিলেন তারা আবু বকরে (রা.) মতো- যদি ঐ প্রশ্ন করতেন তবে তিনি প্রত্যেককেই ঐ জবাব দিতেন। "আমার যে কাজ" বলতে তিনি কী বুঝিয়েছিলেন? তাঁর কী কাজ ছিল? তাঁর কাজ তো মাত্র একটা, যে কাজ আল্লাহ তাঁর উপর অর্পণ করেছেন। সেটা হলো সমস্ত রকমের জীবনব্যবস্থা 'দীন' পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে এই শেষ দীনকে মানব জীবনে প্রতিষ্ঠা করা। ইতিহাসে পাচ্ছি, শেষ-ইসলামকে গ্রহণ করার দিনটি থেকে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আবু বকর (রা.) এর কাজ একটাই হয়ে গিয়েছিল। সেটা ছিল মহানবীর সংগ্রামে তাঁর সাথে থেকে তাঁকে সাহায্য করা। শুধু আবু বকর (রা.) নয়, যে বা যারা নবীকে বিশ্বাস করে মুসলিম হয়েছেন সেই মুহূর্ত থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি বা তারা বিশ্বনবীকে তাঁর ঐ সংগ্রামে সাহায্য করে গেছেন, তাঁর সুন্নাহ পালন করে গেছেন। আর কেমন সে সাহায্য! স্ত্রী-পুত্র-পরিবার ত্যাগ করে, বাড়ি-ঘর, সম্পত্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য ত্যাগ করে, অর্ধাহারে-অনাহারে থেকে, নির্মম অত্যাচার সহ্য করে, অভিযানে বের হয়ে গাছের পাতা খেয়ে জীবন

ধারণ করে এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন বিসর্জন দিয়ে। এই হলো তার উম্মাহ, উম্মতে মোহাম্মদী, তাঁর প্রকৃত সুন্নাহ পালনকারী জাতি। তারা তাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে কতখানি সচেতন ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিশ্বনবীর ইন্তেকালের পর তাঁর উম্মাহর ইতিহাস থেকে। নেতার পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জাতিটি স্বদেশ (আরব) থেকে বের হয়ে উত্তাল ঢেউয়ের মত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল এবং সর্বদিক দিয়ে তাদের চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী দুইটি বিশ্বশক্তিকে সামরিকভাবে পরাজিত করে তদানিন্তন অর্ধেক পৃথিবীতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অর্থাৎ তওহীদভিত্তিক সত্যদীন প্রতিষ্ঠা করল। ঐ উম্মাহর শতকরা আশি জনেরও বেশীর কবর তাদের স্বদেশ আরবের বাইরে হয়েছে। এটাই হচ্ছে উম্মতে মোহাম্মদীর পরিচয়।

বর্তমানে উম্মতে মোহাম্মদী হিসাবে যারা পরিচয় দেন, তাদের কাছে ইসলামের মূল কাজ হলো টাখনুর উপর পায়জামা, খাওয়ার পূর্বে লবন খাওয়া, ডান কাত হয়ে শোওয়া, লম্বা জোব্বা, পাগড়ি, লম্বা দাড়ি, কাঁধে চেক রুমাল আর পাড়া মহল্লা কাঁপিয়ে মিলাদ ও জেকের করা, ব্যাস এই হলো উম্মতে মোহাম্মদী। এদের সামনে শান্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অপরিচিত। দুনিয়াময় পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী 'সভ্যতা' অর্থাৎ দাজ্জালের শাসন, তাগুতের সার্বভৌমত্ব চলছে নাকি আল্লাহর সার্বভৌমত্ব চলছে, এটা তাদের বিবেচ্য নয়, দুনিয়াময় মুসলিম নামক জাতিটি অন্য জাতির লাথি খাচ্ছে খাক, নির্যাতিত হোক, এদের নারীরা ধর্ষিতা হচ্ছে হোক এটাও তাদের কাছে বিবেচ্য বিষয় নয়। প্রশ্ন হলো, এই জাতীয় নির্জীব, নির্বিকার অন্তর্মুখী বিচ্ছিন্ন জনসংখ্যাকে মানবজাতির সেরা বিপ্লবী রসুলাল্লাহ কি তাঁর উম্মাহ বলে স্বীকার করবেন?

[মূলঃ মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী,
সম্পাদনাঃ মোঃ রিয়াদুল হাসান, যোগাযোগঃ হেযবুত তওহীদ, ফোনঃ ০১৬৭০-১৭৪৬৪৩, ০১৭১১-০০৫০২৫]

জাতীয় ঐক্য সৃষ্টিতে ইসলাম

মোহাম্মদ আসাদ আলী

মুক্তিযুদ্ধের সময় সাত কোটি বাঙালি ছিল একজন নেতার পেছনে ঐক্যবদ্ধ। নেতা বলেছেন যার যা আছে তা-ই নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে, জাতি সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র হাতে নেমে পড়েছে। পরিনাম কী হবে না হবে দেখার প্রয়োজন বোধ করেনি। নেতার প্রতি এই অগাধ বিশ্বাস ও আনুগত্য বৃথা যায়নি। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ঐক্য, শৃঙ্খলা ও আনুগত্যের ফসল ঘরে তুলেছিল বাংলাদেশ। ছিনিয়ে এনেছিল স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য।

প্রশ্ন হলো, তখন কি কেউ ঘুনাক্ষরেও ভেবেছিল, এমন একটা ঐক্যবদ্ধ জাতিসত্ত্বাও ভেঙে খান খান হয়ে যাবে কিছুদিন পরেই? না। এমন অশুভ ভাবনা হয়ত কারো মাথাতেই আসেনি। সবাই ধরেই নিয়েছিল এই ঐক্য হবে অখণ্ডণীয়, টেকসই। কারণ, এবার আর ভিন্ন ভাষাভাষী নই, আমরা একই ভাষার, একই সংস্কৃতির, একই ধর্মের মানুষ একত্রে বসবাস করার সুযোগ পাব, এখন আর নেই পাকিস্তানী জুলুম, বা ইংরেজ শোষণ! কিন্তু স্বাধীনতার কিছুদিন পরেই আমাদের পিছু নিল ইংরেজ আমল থেকে চলে আসা সেই চিরচেনা রাজনৈতিক বিভাজন, শত্রুতা, ও দলাদলি। যা কিছুদিন আগেও ছিল অবিশ্বাস্য!

'৭৫ এ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বপরিবারে হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে শুরু হলো এক ভাষা, এক ধর্ম, এক জাতির ভ্রাতৃঘাতি সংঘাতের ইতিহাস। প্রথম ধাক্কাটাই আসলো ঐক্যের উপর। নতুন নতুন দল হতে লাগলো। আবার আগে থেকে চলে আসা দলগুলোও ভাঙতে থাকল। একটা দল ভেঙে দুইটা হলো, দুইটা ভেঙে চারটা হলো। এভাবে ভাঙতেই থাকল। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকল দলের সংখ্যা, নেতার সংখ্যা, নীতির সংখ্যা। ভিন্ন ভিন্ন দলের স্বভাবতই ভিন্ন লক্ষ্য, ভিন্ন দাবি, ভিন্ন স্লোগান তৈরি হলো। স্বাধীনতার ৫০ বছর পর সেই সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছে শতাধিক। এখনও প্রতি বছরই নতুন রাজনৈতিক দল আত্মপ্রকাশ করছে। এক দলের লক্ষ্য আরেক দলকে পরাজিত করাই নয় শুধু, নিশ্চিহ্ন করে ফেলা।

এখন আর কোনোকিছুই আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে না। এখন যাই ঘটে, যে ইস্যুই তৈরি হয়, আমাদের অনৈক্যই শুধু বাড়তে থাকে। ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতি, মতাদর্শ- সবকিছুই এখন হয়ে উঠেছে বিভেদের যন্ত্র! পরিতাপের বিষয় হলো এখনও আমাদের বুদ্ধিজীবীরা, পণ্ডিতরা, সুশীল মহোদয়রা ভেবেই বের করতে পারছেন না কেন আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গনের এই শোচনীয় অবস্থা। এমনকি অনেক সময় তারা নিজেরাই বিভিন্ন দলের লেজুড়বৃত্তি করতে গিয়ে আরেক দলের বিরুদ্ধে কুৎসা গাইতে থাকেন, আর সবকিছুর জন্য ওই দল বা দলের নেতাকেই বকতে থাকেন। অথচ তোপের মুখে পড়া ওই নেতা বা ওই দলের জন্মেরও শত বছর আগে থেকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক হানাহানি, কোন্দল, দলাদলি, অস্থিরতা, দাঙ্গা ইত্যাদি চলে আসছে। একটু সত্যান্বেষী মন থাকলে তারা হয়ত দেখতে পেতেন যে, ইংরেজরা যবে থেকে ভারতবর্ষে পশ্চিমা তন্ত্র-মন্ত্র, বাদ-মতবাদ ইত্যাদি প্রবর্তন করেছে ও আমাদের নেতারা গভীর আগ্রহের সঙ্গে সেগুলো গলধঃকরণ করা শুরু করেছে, তখন থেকেই শুরু হয়েছে ভারতবাসীর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-কলহের ইতিহাস। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় এই যে, আমরা ভারতবর্ষের একভাগ আরেকভাগের সঙ্গে শত্রুতা করে ছাড়াছাড়ি করে ফেললেও কখনই ব্রিটিশের প্রবর্তিত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বিচারিক, প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবতে পারিনি। এগুলো শত জনমের আরাধ্য ধনের মতো আকড়ে ধরে রেখেছি, আর একইভাবে আমাদেরকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে রাজনৈতিক বিভাজন, হানাহানি।

এই ব্যবস্থা আমাদের ১৬ কোটি মানুষকে ভেতর থেকে শেষ করে দিয়েছে। আর বাইরের সাম্রাজ্যবাদী শত্রুরা তো সর্বদাই নিঃশ্বাস ফেলছে ঘাড়ের উপর, যার একটি থাবাও মোকাবেলা করার সক্ষমতা আমাদের নেই। নির্বাচনের আগে আমাদের রাজনৈতিক নেতারা কেউ ছুটে যায় দিল্লি, কেউ যায় নিউইয়র্ক, কেউ লন্ডন। সেখানে গিয়ে কী দেন-দরবার চলে তা একমাত্র তারাই জানেন। তবে আমরা এটুকু বুঝি- বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো বাংলাদেশের শুভাকাঙ্ক্ষী নয়! তারা সুযোগসন্ধানী! তারা কীভাবে ইরাক, সিরিয়া, আফগানিস্তান, লিবিয়া, ইয়েমেনের রাজনৈতিক বিভাজনের সুযোগ নিয়ে দেশগুলোকে গণকবর বানিয়েছে তা সবারই জানা। তারপরও তাদের

হস্তক্ষেপ প্রয়োজন পড়ে আমাদের, নিজেরাই দাওয়াত করে তাদেরকে ডেকে আনি আমাদের রাজনৈতিক সঙ্কটের সমাধান করে দেওয়ার জন্য, কারণ তাদের তেরি রাজনৈতিক ব্যবস্থাই আমরা অনুসরণ করি, তারাই আমাদের আদর্শিক গুরু! সেই গুরুরা যদি একদিনের জন্যও আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে দিতে পারতেন তবু একটা শান্তনা পাওয়া যেত।

প্রশ্ন হলো, এখন কী করণীয়?

করণীয় খুবই পরিষ্কার। ব্রিটিশের তৈরি অনৈক্য সৃষ্টিকারী ব্যবস্থাকে পাল্টাতে হবে এবং এমন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যা সহজেই জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম। যে ব্যবস্থায় থাকবে না কোনো রাজনৈতিক বিরোধ, দলাদলি-শত্রুতা ও সহিংসতার বীজ। এক্ষেত্রে আমাদের প্রস্তাবনা হলো আল্লাহর তওহীদভিত্তিক জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ, সুশৃঙ্খল ও সমৃদ্ধ জাতি গঠন করা। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, তিনি জানেন কোন সূত্র প্রয়োগ করলে, কোন নীতিমালা অনুসরণ করলে একটি জাতি সহজেই ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে ও ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারবে। সেই সূত্র ও নীতিমালা তিনি তাঁর দ্বীনে যুক্ত করে দিয়েছেন। দ্বীনকে এমনভাবে সাজিয়েছেন যার সর্বস্তরে আছে ঐক্যের শিক্ষা ও প্রেরণা।

জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে ইসলামে যে ব্যবস্থাগুলো আল্লাহ রেখেছেন ও আদেশ নিষেধ করেছেন তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ একটি কলামে তুলে আনা প্রায় অসম্ভব। তাতে লেখার কলেবর অনেক বড় হয়ে যাবে। সেদিকে না গিয়ে এই ছোট্ট লেখায় আমরা শুধু কয়েকটি বিষয় উদাহরণস্বরূপ তুলে আনার চেষ্টা করব, যা সচেতন পাঠকদের জন্য যথেষ্ট হবে বলে মনে করি। আসুন জেনে নেওয়া যাক ইসলাম জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি ও রক্ষায় কী ব্যবস্থা রেখেছে।

১. বস্তুত ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছাড়া মো'মেন হওয়াই অসম্ভব। ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হলো তওহীদ (এই অঙ্গীকার করা যে, জীবনের সর্বাঙ্গনে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে হুকুমদাতা, বিধানদাতা বলে মানবো না)। একজন মানুষ যখন তওহীদের ভিত্তিতে সমাজ গড়ার জন্য ঐক্যবদ্ধ হন, তখন তাকে বলা হয় মো'মেন।

২. তওহীদ গ্রহণের পর মো'মেনের প্রধান দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায় তওহীদভিত্তিক দ্বীনকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করা। আর তা করতে গেলেই দেখা যায়, আল্লাহ মো'মেনদেরকে দ্বীন প্রতিষ্ঠার যে কর্মসূচি দান করেছেন তার পাঁচটি দফার প্রথম দফাই হলো ঐক্য। হাদিসের ভাষ্যমতে- কোনো ব্যক্তি যদি তওহীদভিত্তিক ঐক্যবন্ধনী থেকে এক বিঘত দূরে সরে যায় তাহলে তার গলদেশ থেকে ইসলামের রজ্জু খুলে যাবে। সে নামাজ পড়লেও, রোজা রাখলেও, নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করলেও জাহান্নামের জ্বালানি পাথর হবে (আল হারিস আল আশয়ারী (রাঃ) থেকে আহমদ, তিরমিযি, বাব উল এমারাত, মেশকাত)। তাহলে দেখা যাচ্ছে তওহীদ গ্রহণ ও তওহীদ প্রতিষ্ঠা- দু'টোই ঐক্যের উপর নির্ভরশীল।

৩. ঐক্য কেমন শক্তিশালী হতে হবে সেটাও আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে বলে দিয়েছেন। মো'মেনদেরকে বলেছেন সীসা গলানো প্রাচীরের মতো ঐক্যবদ্ধ থাকতে। (সফ: ৪) সীসা গলানো প্রাচীরে একটা সুই ঢোকানোর মতোও ছিদ্র থাকে না। আল্লাহ মো'মেনদেরকে আরও বলেছেন আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হতে। (ইমরান: ১০৩) তাছাড়া অতীতের জাতিগুলোর অনৈক্য-সংঘাত ও তার পরিণতির উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ সতর্ক করেছেন, ওইসব জাতির মতো দলে-উপদলে বিভক্ত হওয়া যাবে না। (ইমরান: ১০৫)

৪. শুধু ঐক্যবদ্ধ হয়েই নিশ্চিন্তে থাকা যায় না, প্রয়োজন ঐক্য বিনষ্টের কারণগুলো চিহ্নিত করে নির্মূল করা। তাই ঐক্য নষ্ট হতে পারে যেসব কারণে তা নিয়েও ইসলামে রয়েছে ব্যাপক সতর্কতা। ঐক্য নষ্ট হবার কারণ প্রধানত দুইটি। একটি হলো গীবত, আরেকটি হলো মতভেদ। গীবতের ব্যাপারে আল্লাহ কোর'আনে কী ভয়াবহ কথা বলেছেন তা সবারই জানা। আল্লাহ মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন গীবত বা পরনিন্দাকে (হুজরাত: ১২)। আর মতভেদ সৃষ্টি হতে পারে যেসব কারণে, তার কোনো স্থানই আল্লাহ এই দ্বীনে রাখেননি। সাধারণত মতভেদ হবার আশঙ্কা থাকে কখন? কোনো বিষয় নিয়ে অতিরিক্ত বিশ্লেষণ, চুলচেরা বিশ্লেষণ ইত্যাদি করলে। মৌলিক বা প্রধান বিষয়কে যথেষ্ট মনে না করে সেটার খুঁটিনাটি ও অপ্রধান অংশ নিয়ে সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ আরম্ভ করলে। এক কথায়, যতটুকু করতে বলা হয়েছে ততটুকুতে সীমাবদ্ধ না থেকে বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হলে। তাই আল্লাহ দ্বীন নিয়ে বাড়াবাড়িকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছেন (নিসা: ১৭১, মায়েদা ৭৭)। আর মতভেদ করে যারা দ্বীনকে কঠিন করে তোলে ও জাতিকে খণ্ড-বিখণ্ড করে, তাদের প্রাপ্য পরকালে বুঝিয়ে দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। (আনআম: ১৫৯)

৫. ঐক্য রক্ষার ব্যাপারে সতর্ক থাকার পরও বাস্তব জীবনে রাজনীতি, অর্থনীতি, বিচারিক, সামাজিক ইত্যাদি বিষয়ে জনগণের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হতে পারে। সেক্ষেত্রে কী করণীয় তার নীতিমালাও আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন। সেটা হলো- কোনো বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হলেই সেটাকে বাড়তে না দিয়ে আল্লাহ ও রসুলের কাছে সোপর্দ করে দিতে হবে। (নিসা: ৫৯) বর্তমানে রসুলাল্লাহ সরাসরি আমাদের মাঝে উপস্থিত নেই, তার মানে জাতির যিনি ইমাম থাকবেন বা কর্তৃপক্ষ থাকবেন, তার বরাবর সোপর্দ করে দিতে হবে এবং তারপর ব্যাপারটা আল্লাহর উপর ছেড়ে দিতে হবে। বিষয়টিকে দলাদলি-কোন্দলের পর্যায়ে নেওয়া যাবে না।

৬. আল্লাহর রসুল এমন একজন রিপুজয়ী মহামানব ছিলেন যাকে দয়া, করুণা ও উদারতার মূর্ত প্রতীক বললে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এই রিপুজয়ী মহামানবকেও আমরা ইতিহাসে দেখতে পায় কখনও কখনও রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে যেতে। খেয়াল করলে দেখা যায় যেসব কারণে জাতির মধ্যে ঐক্য নষ্ট হবার আশঙ্কা থাকে, শুধু তেমন কোনো ঘটনা দেখলেই আল্লাহর রসুল রেগে লাল হয়ে যেতেন। যেমন, হাদিসে পাওয়া যায় কুরআনের আয়াতের অর্থ নিয়ে দু'জন সাহাবীকে তর্ক-বিতর্ক করতে দেখে রসুল (সা.) রেগে লাল হয়ে গিয়েছিলেন, এছাড়া একজন সাহাবী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অতিরিক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় রসুল (সা.) রেগে লাল হয়ে গিয়েছিলেন। এই সুন্নাহ পুরো জাতি অনুসরণ করলে, অর্থাৎ কাউকে ঐক্য ভঙ্গের কাজ করতে দেখলেই তাৎক্ষণিক বাকি সবাই বাধা দিলে ঐক্য ভঙ্গের আশঙ্কাই থাকবে না।

৭. কেবল মুখে মুখে ঐক্যের উপদেশ দিলেই তো সমাজে সীসা গলানো প্রাচীরের মতো ঐক্য তৈরি হয়ে যাবে না। ঐক্যের চেতনা মানুষের মনে, মগজে, চিন্তায়, এমনকি অবচেতন মনেও গেঁথে দিতে হবে, কায়েম করতে হবে। সেটার উপায় কী? সেই উপায়ও আল্লাহ বলে দিয়েছেন, কারণ আল্লাহ হলেন সোবাহান, পরিপূর্ণ, নিখুঁত, নির্ভুল। তিনি ঐক্যের নির্দেশ দিবেন কিন্তু ঐক্য সৃষ্টির উপায় বলবেন না তা হতে পারে না। উপায় হিসেবে আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, যার প্রধান কাজ হলো মো'মেনদের চরিত্রে, চিন্তায় ও অবচেতন মনে ঐক্য, শৃঙ্খলা ও আনুগত্যের গুণাবলি কায়েম করা, প্রতিষ্ঠা করা। দিনে পাঁচবার মসজিদে একত্রিত হয়ে (ঐক্যবদ্ধ হয়ে), নিজেদের মধ্যেকার সমস্ত বিভেদ-মনোমালিন্য ভুলে, একজন নেতার পেছনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে সালাহ কায়েম করার মাধ্যমে মো'মেনদের চরিত্রে ঐক্যের চেতনা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ফলে সর্বদা তাদের মনে গেঁথে থাকে একটি অমোঘ সত্য- আমি একা নই, বিচ্ছিন্ন নই, নেতৃত্বহীন নই, উদ্দেশ্যহীন নই, আমার জাতি আছে, সঙ্গী-সাথী আছে, নেতা আছে, নেতার আনুগত্য করার দায়বদ্ধতা আছে।

মোদ্দাকথা, মানুষের তৈরি ব্যবস্থায় ঐক্য সৃষ্টি করা যতটা কষ্টসাধ্য কাজ, আল্লাহর দেওয়া ব্যবস্থায় তেমনই কঠিন কাজ হলো অনৈক্য সৃষ্টি করা। কারণ, আল্লাহর দেওয়ার ব্যবস্থার ধাপে ধাপে, স্তরে স্তরে রয়েছে ঐক্যের উপাদান। আল্লাহর দেওয়া ব্যবস্থার কাঠামোটাই এমন, যেখানে সবার উপরে থাকে তওহীদ তথা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, যা পুরো জাতিকে ঐক্যসূত্রে গেঁথে রাখে। তারপরে থাকেন একজন ইমাম, যিনি হন অবিসংবাদিত, তারপর থাকেন ইমাম কর্তৃক নিযুক্ত আমিরগণ। কোনো বিষয়ে ইমামের সিদ্ধান্ত হয়ে গেলে, মুহূর্তেই সেই সিদ্ধান্ত আমিরগণের মাধ্যমে পুরো জাতির কাছে পৌঁছে যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে পুরো জাতি ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য। মানি না, মানব না- এই স্লোগানের সুযোগ, প্রয়োজন বা ইচ্ছা কোনোটাই জনগণের থাকে না। কোনো পদের জন্য, অর্থের জন্য, ক্ষমতার জন্য, খ্যাতির জন্য কেউ জাতিকে বিভক্ত করার চেষ্টা করলে, জাতির ঐক্যে ভাঙন ধরানোর চেষ্টা করলে, জনগণই তাকে "মুনাফিক" হিসেবে চিহ্নিত করে ফেলে।

এই ব্যবস্থার চেয়ে উত্তম ব্যবস্থা আর কী হতে পারে?

[লেখক: সাহিত্য সম্পাদক, দৈনিক বজ্রশক্তি
মো. আসাদ আলী]

“প্রতিটি শিশুকে ঘিরে পরিবারের স্বপ্ন বাস্তবায়নে কাজ করে চলেছে আপন ফাউন্ডেশন।”

শিশু মনোবিজ্ঞানী ডা. সুলতানা রাজিয়া

বিশিষ্ট শিশু মনোবিজ্ঞানী ও আপন শিশু বিকাশ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ডা. সুলতানা রাজিয়া। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ থেকে বেসিক থেরাপিউটিক কাউন্সেলিং এবং এডভান্স কাউন্সেলিং এর উপর প্রশিক্ষণ নেন এবং Dhaka University Psychology Alumni Association (DUPAA) এর আজীবন সদস্যপদ লাভ করেন। তিনি Bangladesh Psychology Association (BPA) I Bangladesh Association for Child & Adolescent Mental Health (BACAMH) এর সদস্য। গত আট বছর ধরে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালের কাকরাইল ও মতিঝিল শাখায় শিশু মনোবিজ্ঞান বিষয়ক কনসালটেন্ট হিসাবে সেবা প্রদান করছেন। শিশুদের চিকিৎসার ব্যাপারে অসঙ্গতি লক্ষ করে সর্বস্তরের শিশুদের সুস্থ-স্বাভাবিক বিকাশ ঘটাতে তিনি প্রতিষ্ঠা (১৬ জুলাই ২০১৬) করেন আপন শিশু বিকাশ ফাউন্ডেশন। সম্প্রতি তিনি দেশেরপত্রের প্রতিবেদক ইলা ইয়াসমিনের মুখোমুখী হন। কথা হয় ‘আপন’ এর দৃষ্টিভঙ্গি ও পথচলা নিয়ে।

• বজ্রশক্তি: আমাদের দেশে শিশু বিকাশ নিয়ে অনেক বেসরকারী উদ্যোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে আপন শিশু বিকাশ ফাউন্ডেশনের বিশেষত্ব কী

ডা. সুলতানা রাজিয়া: শিশুদেরকে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের ফাউন্ডেশন কাজ করছে। বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানই বিশেষায়িত, তারা কোনো বিশেষ একটি শ্রেণির শিশুদেরকে নিয়ে কাজ করে। কেউ পথশিশু, কেউ প্রতিবন্ধী শিশু, কেউ হয়তো অটিজম আক্রান্ত শিশুদের নিয়ে কাজ করে। কিন্তু ‘আপন’ সমাজের সর্বস্তরের এবং সবধরনের শিশুদের বিকাশ নিয়ে কাজ করে। সুস্থ শিশু, প্রতিবন্ধী শিশু, অটিস্টিক শিশু, আচরণের সমস্যাগ্রস্ত শিশু, দুঃস্থ শিশু, পথশিশু ইত্যাদি সবশ্রেণির শিশুদের নিয়েই আপন কাজ করছে। কোনো নির্দিষ্ট শহর বা জেলায় নয়, আপনের কাজ দেশজুড়ে চলমান। একটি শিশু একটি স্বপ্ন। প্রতিটি শিশুকে ঘিরে পরিবারের স্বপ্ন বাস্তবায়নে কাজ করে চলেছে আপন।

• বজ্রশক্তি: অটিস্টিক শিশুকে নিয়ে তাদের বাবা-মাকে অনেক সময় বিব্রতকর প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়।

ডা. সুলতানা রাজিয়া: শুধু অটিস্টিক নয়, শিশুদের যেকোনো অস্বাভাবিক বা অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণের জন্য অনেক সময় অভিভাবকদের কটূকথা বা অপমানজনক কথা শুনতে হয়। সেক্ষেত্রে আমি বলব, প্রতিটি শিশুই সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদ, প্রতিটি শিশুই পবিত্র। “আমার শিশু আমার অহংকার” এই কথা মনে রেখে বাবা-মাকে প্রথমেই মানসিকভাবে একটা শক্ত অবস্থানে দাঁড়াতে হবে। এই ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে এই কথা মেনে নিয়েই তার সঠিক মোকাবেলা করার জন্য তৈরি থাকতে হবে। সেজন্য প্রয়োজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ এবং মতামত। আপন ফাউন্ডেশন বিনামূল্যে এই সেবাটিও দিয়ে থাকে।

• বজ্রশক্তি: বিশেষ শিশুদের চিকিৎসা ব্যয় বেশি হওয়ায় অনেক বাবা-মা শিশুদের সঠিকসময়ে চিকিৎসা করাতে পারেন না। এক্ষেত্রে করণীয় কি?

ডা. সুলতানা রাজিয়া: বিশেষ শিশুদের চিকিৎসা হওয়ার কথা ছিলো সহজ-সরল এবং অল্প খরচে। অথচ আমাদের দেশের বিশেষ স্কুলগুলোতে সাধারণ স্কুলগুলোর চাইতে কয়েকগুণ বেশি ব্যয়ভার বহন করতে হয়। চিকিৎসার ক্ষেত্রেও একই দৃশ্য দেখা যায়।

ফলে অভিভাবকগণ অর্থের অভাবে, সঠিক চিকিৎসার অভাবে এই ধরনের শিশুদের নিয়ে কষ্টকর জীবন-যাপন করছেন। আপন ফাউন্ডেশন নিজ খরচে দেশজুড়ে চিকিৎসা ক্যাম্পেইন করছে এবং খুঁজে বের করে এইসব শিশুকে স্বল্প খরচে চিকিৎসা দেয়ার চেষ্টা করছে।

• বজ্রশক্তি: অনলাইন এবং অফলাইনে আপনের কী কী সেবা রয়েছে?

ডা. সুলতানা রাজিয়া: অনলাইন এবং অফলাইনে 'আপন' এর বেশকিছু প্রোগ্রাম এবং সেবা রয়েছে। শিশুদের সুষ্ঠু মানসিক বিকাশ নিশ্চিত করার জন্য অনলাইনে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক ইভেন্টের আয়োজন করা হয়। ইউটিউব চ্যানেলে অভিভাবকদের সচেতন করার লক্ষ্যে শিশুদের বিভিন্ন সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে ভিডিও বক্তব্য দেয়া হয়। অফলাইনে স্পিচ থেরাপি, ওকুপেশনাল থেরাপি, কগনেটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি, প্লে থেরাপি, ফ্যামিলি কাউন্সেলিং, স্টুডেন্ট কাউন্সেলিং, জাতীয় দিবসগুলোতে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পিং, সভা, সেমিনার, র‍্যালি ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

• বজ্রশক্তি: অটিস্টিক শিশুরা কি সুস্থ হয়?

ডা. সুলতানা রাজিয়া: অটিজম হল মস্তিষ্কের স্নায়ুর গঠনজনিত একটা সমস্যা। এই শিশুদের মধ্যে অনেক ধরন রয়েছে। যেমন: মৃদু, মাঝারি এবং প্রচণ্ড। যারা মৃদু ও মাঝারি সমস্যাগ্রস্ত তাদেরকে সঠিক সময়ে সঠিক ব্যবস্থাপনা দিতে পারলে তারাও আর দশটা সুস্থ শিশুর মতো জীবনযাপন করতে পারবে।

• বজ্রশক্তি: অটিস্টিক শিশুরা কর্মজগতে কিভাবে অংশ নিতে পারে?

ডা. সুলতানা রাজিয়া: অটিস্টিক শিশুরাও সমাজের সকল কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে। প্রত্যেকটা সেক্টরে তাদের জন্য আলাদা একটা ব্যবস্থা রাখা উচিত। তাদের ছোটখাট সবকাজকে প্রশংসা করলে, তাদেরকে অন্য দশজন স্বাভাবিক মানুষের দৃষ্টিতে দেখা হলে তারাও কর্মজগতে সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

• বজ্রশক্তি: বাবা-মায়েরা অধিকাংশ সময় শিশুদের ডিজিটাল ডিভাইস আসক্ত করে তোলেন। তাহলে শিশুদেরকে কী করে এই আসক্তি থেকে মুক্ত করা সম্ভব?

ডা. সুলতানা রাজিয়া: এ প্রশ্নটি খুবই সময়োপযোগী। ছোটবেলা থেকে আদর করে হোক, বা নিজের কাজের সুবিধার জন্যই হোক বাবা-মা সন্তানকে ডিজিটাল ডিভাইসের সংস্পর্শে নিয়ে আসেন। টিভি দেখিয়ে বা মোবাইল ফোনে ভিডিও দেখাতে দেখাতে বা গেমস খেলতে দিয়ে বাচ্চাদেরকে খাওয়ানোর অভ্যাস করেন। ফলে একটা নির্দিষ্ট সময় পর বাচ্চারা এইসব ডিভাইসের প্রতি আসক্ত হয়ে যায়। ছোটবেলায় আমাদের মা, দাদি-নানিরা যেমন গল্প বলে, ছড়া শুনিয়ে, অভিনয় করে, বাইরের দৃশ্য দেখিয়ে খাওয়াতেন সেভাবে বাচ্চাদেরকে খাওয়ানোর অভ্যাস করতে হবে। এতে করে বাচ্চার কথা বলা, বুদ্ধিবিকাশ, সামাজিক বিকাশ সুষ্ঠুভাবে হবে। মোবাইল ফোনে অথবা ভিডিও গেমস খেলার ডিভাইস বাদ দিয়ে তাদেরকে যদি খোলা মাঠে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী করা যায়, ছবি আঁকা, বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করানো যায় তবে আমি মনে করি এই আসক্তি থেকে তাদেরকে খুব সহজেই মুক্ত করা সম্ভব। তাদেরকে কিছু একটা দিয়ে বসিয়ে রাখার পরিবর্তে তাদেরকে সময় দিতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই।

• বজ্রশক্তি: বর্তমানে অটিজম আক্রান্ত শিশুর জন্মগ্রহণ বেড়ে যাওয়ার কারণ কী?

ডা. সুলতানা রাজিয়া: এই বিষয়ের আসলে সত্যিকার নির্দিষ্ট কোনো কারণ এখনও প্রকাশ হয় নি। মস্তিস্কের স্নায়ুর গঠনজনিত কারণে এই সমস্যা হয়। অটিজম সমস্যাটি মূলত শহরকেন্দ্রিক এবং একক পরিবারগুলোতে অটিজম আক্রান্ত শিশুর জন্মহার বেশি। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে - গর্ভাবস্থায় ভাইরাস সংক্রমণ, ক্ষতিকর ঔষধ সেবন, গর্ভস্থ জটিলতা, পরিবেশ দূষণ, বাতাসে অতিরিক্ত সিসা, ভেজাল মিশ্রিত খাবার, পানি দূষণ, প্রযুক্তির অত্যধিক ব্যবহারে রেডিয়েশনের প্রভাবে অনেক সময় গর্ভস্থ ভ্রুণের মস্তিষ্ক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অটিজম হতে পারে। তাছাড়া গর্ভাবস্থায় মায়েদের রক্তক্ষরণ, অনিয়ন্ত্রিত ডায়বেটিস, হাই প্রেশারের জন্যও নবজাতকের অটিজম দেখা দিতে পারে।

• বজ্রশক্তি: আপন ফাউন্ডেশনের ব্যয় নির্বাহ হয় কিভাবে? আপনারা কি কোনো সরকারী বা বেসরকারী অনুদান পাচ্ছেন?

ডা. সুলতানা রাজিয়া: ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ অব্দি আপন এর সকল কার্যক্রম ফাউন্ডেশনের সদস্যদের চাঁদার অর্থে পরিচালিত হচ্ছে। তবে আমরা যদি সরকারি-বেসরকারি অনুদান পাই তবে আমরা দেশজুড়ে আরও ব্যাপকভাবে আমাদের সেবামূলক উদ্যোগসমূহ পরিচালিত করতে পারব ইনশাল্লাহ।

• বজ্রশক্তি: আপন এর সফলতা বা ব্যর্থতার মূল্যায়ন কীভাবে করবেন?

ডা. সুলতানা রাজিয়া: সত্যিকার অর্থে, সফলতা বলেন আর ব্যর্থতাই বলেন তা নির্ভর করবে আপনার আমার কাজের পরিণতির উপর। এই ফাউন্ডেশনের আওতায় যারাই সেবা গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে যারা নিয়মিত করেছে তাদের ৯৫% শিশু আলহামদুলিল্লাহ সুস্থ জীবনযাপন করছে। অভিভাবকদের অসচেতনতা এবং আর্থিক সমস্যার কারণে অনেকে চিকিৎসা নিয়মিত করে না। তাদেরকে সচেতন করে তোলাটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ। আমাদের শ্লোগান 'সুস্থ শিশু সুরক্ষিত আগামী'। এটা নিশ্চিত করতে নিজেদের সবটুকু আন্তরিকতা ও শ্রম উজাড় করে আমরা কাজ করছি। তবে এজন্য অভিভাবকদের সহযোগিতা খুব বেশি প্রয়োজন।

ডা. সুলতানা রাজিয়া, শিশু মনোবিজ্ঞানী ও চেয়ারম্যান
আপন শিশু বিকাশ ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

ইসলামাইজেশনের চুনকাম বনাম প্রকৃত ইসলাম প্রতিষ্ঠা

জাফর আহমদ

১৯৮২ সালে সামরিক আইন জারি করার মাধ্যমে ক্ষমতায় আসার পর লে. জে. হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ মিডিয়া, জনগণ এবং ছাত্র-যুবকদের মধ্যে আস্থাহীনতার সংকটে পড়েন। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্যই হঠাৎ বিভিন্ন মসজিদে জুমার নামাজে হাজির হওয়া শুরু করলেন। সফেদ পাঞ্জাবি ও টুপি পরে মুসল্লিদের উদ্দেশে মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন- গতরাতে স্বপ্ন দেখেছি আপনাদের এই মসজিদে নামাজ পড়ছি। এরপর শর্শিনা, চরমোনাই ও আটরশির পীরের দরবারে হাজির হলেন। কিছুদিন পর তিনি জাকাত বোর্ড, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং সংবিধানে ইসলামকে 'রাষ্ট্রধর্ম' হিসেবে ঘোষণা, বায়তুল মোকাররম মসজিদের সৌন্দর্য বর্ধনের কাজ করলেন।

তারও আগে মেজর জিয়াউর রহমানের সংবিধানের শুরুতে বিসমিল্লাহ লিখা, পাকিস্তানে জেনারেল জিয়াউল হকের শরীয়া আদালত প্রতিষ্ঠা- এসব হলো সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের কুমতলব লুকিয়ে রেখে সমাজ ও রাষ্ট্রকে ইসলামীকরণ বা ইসলামাইজেশনের প্রতারণার কৌশল। ইসলামের একটা বাহ্যিক মোড়ক দেখিয়ে মানুষকে বোঝানো যে দেখ, আমরা ইসলামকে কত ভালোবাসি, আমরা ইসলামের পক্ষের লোক।

ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিক শাসন অবসানের পর দেশীয় শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতায় আসেন। তারা ছিলেন পাশ্চাত্য ভাবধারার শিক্ষায় শিক্ষিত। তারা ধর্মীয় অনুশাসনে বিশ্বাসী ছিল না। শুধু ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য জনসমর্থন দরকার, আর দেশের অধিকাংশ লোক ধর্মভীরু। এই ধর্মভীরু জনগণের ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতার মসনদকে দীর্ঘকাল ভোগ করার জন্য মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামের নামে কিছু কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়। এটাকে ইসলামীকরণ বা ইসলামাইজেশন বলা হয়। মরক্কো, মিশর, সুদান, তুরস্ক, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ব্রুনাই, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং সৌদি আরব ও আমিরাতেও এ ধরনের "মুখ মে শেখ ফরিদ আওর বগলমে ইট" মার্কা পপুলার ইসলাম কায়েমের কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়। সবদেশেই শাসকগোষ্ঠী একাজে ধর্মব্যবসায়ী আলেমদের সাথে নিয়ে বড় বড় ধর্মসভায় এসব মেকি ইসলামের কর্মসূচি ঘোষণা করে থাকে।

একটি আশ্চর্য বিষয় হলো ইসলামাইজেশনের পরও দেশে অশ্লীল নাচ, মদের উৎপাদন, বিপনন, ভোগ, নারীর প্রতি সহিংসতা, ঘুষ-দুর্নীতি, সমাজে অন্যায়, অবিচার, হত্যা-রক্তপাত সমান্তরালভাবে চলতে থাকে। ইসলামাইজেশনের পরও জনগণ ন্যায়বিচার, মানবাধিকার এবং সুশাসন থেকে বঞ্চিত থাকে। এই শাসকরাই জনগনের অর্থ আত্মসাৎ করে বিদেশে সম্পদের পাহাড় বানায়।

ইসলামাইজেশনের আরো একটি ধারা লক্ষ করা যায়। ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো বিকৃত ইসলামের প্রবক্তা। এ ধারা হলো ব্যক্তিগত জীবনে বেসরকারি সবুজ ইসলামাইজেশনের ধারা। রসুলাল্লাহর কবরের উপর নির্মিত সবুজ গম্বুজের সাথে মিল রেখে এদের পাগড়ির রং সবুজ, ইসলামী ব্যাংকগুলোর লোগো ও সাইনবোর্ড সবুজ, আতর, সুরমার ব্যবহার, মিলাদে গোলাপ জল ছিটানো, ইফতার মাহফিলের ছড়াছড়ি, জন্মে আকিকা-মৃত্যুতে চল্লিশার মেজবানি, মসজিদে ফরজ নামাজের চেয়ে বেশি জাঁকজমক করে খতম তারাবি, তাফসীর ও ওয়াজ মাহফিলের

নামে পরস্পর কুৎসা রটানো এবং শেরেকি আকিদার প্রচার, পাড়ায়-মহল্লায় হেফজখানা-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা যেখানে ছাত্রদেরকে কোর'আনের অর্থ না শিখিয়ে কেবল মুখস্ত করানো হয়, চোখ ঝলসানো নকশায় প্রাসাদোপম মসজিদ-মিনার নির্মাণের প্রতিযোগিতা-এসব হলো রাষ্ট্রের বাইরে ইসলামাইজেশনের তৃপ্তির ঢেকুর। এরা মনে করে ব্যক্তিগত আমল করে জান্নাতে যাওয়া যাবে।

রাষ্ট্রীয় ইসলামাইজেশন সমাজে উপর থেকে আরোপ করা হয়। অন্যদিকে রাজনৈতিক দল, পীরের দরবার, মাদ্রাসা এবং আলেমদের মাধ্যমে জারিকৃত সবুজ চাঁদতারার ইসলামাইজেশন সমাজের মূল স্রোতের বাইরে একটি বিচ্ছিন্ন ধারা। ইসলামাইজেশনের এ ধারায় সমাজের উপর আপাতঃ ইসলামের প্রলেপ লাগানো হয়। সমাজের পরতে পরতে শিরক, জুলুম, দুর্নীতি এবং কবিরা গোনাহের জয়জয়াকার অবস্থা বিরাজ করে থাকে। রাষ্ট্রের যে কর্ণধারগণের নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় রাষ্ট্রধর্ম বা কিছু ইসলামি রীতি চালু করা হয়-তারা ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামি অনুশাসনের চেয়ে পাশ্চাত্য ভোগবাদী সভ্যতাকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন। শুধু নিজেদের রাজনৈতিক সুবিধার জন্য ধর্মপ্রাণ আমজনাতার সমর্থন তাদের প্রয়োজন।

একটি বিষয় লক্ষণীয়- একদিকে তাকওয়ার আমল, ইসলামি জলসা, হেফজখানা ও রাজপ্রাসাদতুল্য মসজিদের সংখ্যা বাড়ছে, অন্যদিকে সমাজে অপরাধ, ধর্ষণ, ঘুষ, দুর্নীতি, রক্তপাত এবং ন্যায়বিচারবঞ্চিত নিরন্ন মানুষের হাহাকারও বাড়ছে।

রাষ্ট্রীয় ইসলামাইজেশন সমাজে উপর থেকে আরোপ করা হয়। অন্যদিকে রাজনৈতিক দল, পীরের দরবার, মাদ্রাসা এবং আলেমদের মাধ্যমে জারিকৃত সবুজ চাঁদতারার ইসলামাইজেশন সমাজের মূল স্রোতের বাইরে একটি বিচ্ছিন্ন ধারা। ইসলামাইজেশনের এ ধারায় সমাজের উপর আপাতঃ ইসলামের প্রলেপ লাগানো হয়। সমাজের পরতে পরতে শিরক, জুলুম, দুর্নীতি এবং কবিরা গোনাহের জয়জয়াকার অবস্থা বিরাজ করে থাকে। রাষ্ট্রের যে কর্ণধারগণের নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় রাষ্ট্রধর্ম বা কিছু ইসলামি রীতি চালু করা হয়-তারা ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামি অনুশাসনের চেয়ে পাশ্চাত্য ভোগবাদী সভ্যতাকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন। শুধু নিজেদের রাজনৈতিক সুবিধার জন্য ধর্মপ্রাণ আমজনাতার সমর্থন তাদের প্রয়োজন।

ইসলামাইজেশনের এসব ধারার বাইরে মানবজাতি নবী-রসুলগণের নেতৃত্বে প্রকৃত ইসলাম প্রতিষ্ঠার এক আলোকিত ধারা লক্ষ্য করেছে। নবীদের সবাই একটি নির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুসরণ করে সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারা প্রথমে মানুষের মনোজগত থেকে শিরকের ধারণার মূলোৎপাটন করে এক সার্বভৌম (ঝড়াবৎবরমহ) আল্লাহর কর্তৃত্বে বিশ্বাসী সকলকে এক পতাকার নীচে ঐক্যবদ্ধ করেছেন। সমাজের ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিভিন্ন শ্রেণি-গোষ্ঠীর মধ্যে সদ্ভাব, নিরাপত্তা এবং শক্তিশালী জাতি গঠনের মূলসূত্রের সন্ধানে লাগাতার আলোচনা (ডায়লগ) করেছেন।

আখেরী নবী আস্তিক-নাস্তিক, ইহুদি-খ্রিষ্টান, আরবি-আজমি, সাদাকালো, দাস এবং মালিক সকল মানুষ একই আদি পিতামাতার বংশধর বলে ঘোষণা দিলেন। জাকাত ও অন্যান্য বণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পদের প্রবাহ গরীব থেকে ধনীর ঘরে নয়--বরং ধনীর গৃহ থেকে গরিবের পর্ণ কুটিরের দিকে প্রবাহিত করে দিলেন। নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করলেন। কঠোরভাবে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা হলো। একজন স্বর্ণালংকার পরিহিতা যুবতী মেয়ে শত মাইল দূরত্বে একাকি ভ্রমণ করলেও তার ইজ্জত ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত ছিল। সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার ও বণ্টন এমনভাবে করা হলো--কয়েক বছরের মধ্যে কপর্দকহীন পরিবারগুলো সচ্ছল হয়ে জাকাত প্রদানকারী হয়ে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে গেল।

প্রকৃত ইসলাম প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি আল্লাহর নিরংকুশ সার্বভৌমত্ব। আল্লাহ নিজ কর্তৃত্বে আসমান-জমিনের গ্রহ-নক্ষত্র এবং সকল ছায়াপথের সুবিশাল ব্যবস্থাপনা মহাজাগতিক শৃংখলা অনুযায়ী করে থাকেন। সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আল্লাহ সরাসরি না করে তার নিয়োজিত প্রতিনিধি (খলিফা) মানুষের হাতে ন্যস্ত করেছেন। এই খেলাফতের দায়িত্ব থেকেই নবী-রসুলগণ সমাজের সকল সদস্যকে নিয়ে সমাজে-রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

আখেরী নবীর ইন্তেকালের পর খোলাফায়ে রাশেদিনগণ এ তাওহীদ বা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে সমাজে শান্তি, শৃংখলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে গেছেন।

এ সময় এমন একটি বহির্মুখী (Extroverte) জাতি গড়ে উঠেছিল যারা জ্ঞান বিজ্ঞানে তৎকালীন

দুনিয়ায় যেমন শ্রেষ্ঠ ছিল -তেমনি আত্মবিশ্বাস ও সামরিক শক্তিতে ছিল অপ্রতিরোধ্য। দুই দশকের মধ্য আফ্রিকার মরক্কো থেকে চীনের কাশগড় পর্যন্ত অর্ধ পৃথিবী তারা ইসলামের ন্যায় বিচার ও শান্তি-শৃংখলার মধ্যে আনতে সক্ষম হয়েছিল।

আল্লাহ চিরন্তন। তাঁর নাজিলকৃত দীনুল হকও চিরন্তন-শাশ্বত। সকল যুগে মানুষের সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় আখেরী নবী ও তার রাশেদীন খলিফাগণের আমলের মতোই এখনো ইসলাম শান্তি প্রতিষ্ঠায় কার্যকর। বর্তমান অশান্তিময় সমাজে মানবজাতির সামনে থেকে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ভিত্তিক প্রকৃত ইসলাম প্রতিষ্ঠাই একমাত্র ঠিকানা। এ কারণে আল্লাহ বলেছেন-

"তোমরা সর্বশক্তি দিয়ে সংগ্রাম করতে থাক- যতক্ষণ না ফিতনা (অন্যায়- অবিচার) নির্মূল হয়ে যায় এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়।" -সুরা আনফাল ৩৯

[লেখক: পরিচালক, বাংলাদেশ সমাজ অধ্যয়ন কেন্দ্র,
ইমেইল: zafar4160@gmail.com,
যোগাযোগ: ০১৬৭০১৭৪৬৫১, ০১৭১১৫৭১৫৮১, ০১৬৭০১৭৪৬৪৩]

ভিজিট করুন
WWW.HEZBUTTAWHEED.ORG